যমুনা-কী তীর

যমুনা-কী তীর

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

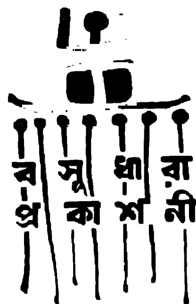
বসুধারা প্রকাশনী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশক : শ্রীজয়ন্ত বসু, বি. এ.,
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬৫

মূল্য তিন টাকা

ব্লক-প্রস্তুতকারক : কালার স্টুডিও,
৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬



প্রচ্ছদ-মুদ্রক : ফাইন প্রিণ্টার্স
প্রাইভেট লিমিটেড,
৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : অজিত গুপ্ত

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬

শ্রীধরিত্রী দেবীকে—

'তোমারে যা দিতে পারি'

নিবেদন

'যমুনা-কী তীর' শারদীয়া 'বসুধারা' (১৩৬৪)-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস তারই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। বিশেষ কোনও ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর কাহিনী রচিত হয়নি। প্রায় তিরিশবছর পূর্বের কলকাতা, কাশী ও গয়ার গাওয়াইয়া সমাজ আর সেই সমাজকে কেন্দ্র ক'রে যাঁরা বাঁচতেন, সেইরকম কতিপয় নরনারীকে স্মরণে রেখে এর কাহিনী রচিত। সেই অতীতদিনের সৌরভগ্রাহী রসিকজনদের চিত্তে সামান্য আনন্দদানের সাফল্যেই এর সার্থকতা।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ সূত্রধারের বিবৃতি ॥

এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার প্রারম্ভে নিবেদন করি শিববাবুর কথা। তাঁর অনুমতিতেই এই প্রসঙ্গ লেখা সম্ভব হল।

ডোভার লেনের সঙ্গীত-সম্মেলন থেকে বাড়ী ফিরলেন শিববাবু রাত চারটেয়। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ময়দানে তখনো নীল কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে। পুব আকাশ ফিকে হয়েছে। এমন উপযুক্ত সময়, তবু রাগ যোগিয়ার সেতারী আলাপটা সহ্য হল না তাঁর। শুনতে পারলেন না। বেরিয়ে এলেন। বাড়ী ফিরে সকালে ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন—সময় হয়েছে, এবার লিখুন।

এর আগে যখন তাঁকে বলেছি—এমন অনন্য একটা জীবন, লিপিবদ্ধ করলে হয় না? তিনি বলেছেন—সময় হয়নি। তারপর তাঁরই ইচ্ছেয় রেকর্ড বাজিয়েছি। আনন্দ মিশ্রের গাওয়া একমাত্র রেকর্ড—'মনে রেখো সখা এ সুখের দিন'।

একমাত্র রেকর্ড, তা-ও বাংলায় গাওয়া···আমার বিস্ময় বুঝে শিববাবু বলেছেন—তা-ও হ'ত না। রেওয়াজ ছিল না। শুধু আমার দিদির অনুরোধে গাওয়া···

বলতে বলতে থেমে গিয়েছেন তিনি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ঝাড়ের আলোগুলো আজকাল জ্বলে না। একটা বাতিতে যতদূর দেখা চলে তাতে মনে হয়েছে শ্রীনটপুরের বাড়ীটা যেন বড্ড বেশী আঁধার। সেই দেওয়াল-জোড়া জাপানী স্ক্রীন—চেরি-ফুলের গাছের

নিচে দাঁড়িয়ে অন্ধ প্রার্থনা করছে সূর্যের দিকে মুখ তুলে ; দরজায় দরজায় কৃষ্ণনগরের পুতুল-প্রহরী পরতে পরতে ধুলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে ; বিষ্ণুপুরের চিকন নক্‌শাপাটিতে দেওয়াল ঢাকা,—এই সব-কিছু আবছা আঁধারে দেখিয়েছে যেন ভূতে পাওয়া। পরিবেশটা যেন কথা কইতে চেয়েছে।

এই মুখর নীরবতার মধ্যে সেই অনন্যসুন্দর কণ্ঠ যোগিয়ায় গেয়ে চলেছে—

'যদি নাহি থাকি সাথে বাসব জাগাতে
তবু ভাতিবে প্রদীপ সে সুখ-নিশীথে
প্রভাতে হাসিবে রবি—
মনে রেখো সখা এ সুখের দিন
ভুলিয়া যাবে কি সবি ?'

পুরোনো গ্রামোফোনে কেমন অশরীরী শুনিয়েছে গলাটা। হাতীর দাঁতের সোফায় উপবিষ্ট বৃদ্ধ শিববাবুকে বিরক্ত না করেই আমি বেরিয়ে এসেছি। মনে হয়েছে ইংরেজী কবিতার সেই নায়কের কথা। অতীতের স্মৃতিতে মনশ্চারণা করতে করতে যার মনে হচ্ছে সে যেন কোন্ পরিত্যক্ত নাটঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাতি নেই, মালা শুকিয়ে গিয়েছে, মানুষ নেই—আছে শুধু স্মৃতির বোঝা আর একটা ঘুমহারা মানুষ। মনে হয়েছে, কবিতায় উল্লিখিত নাটঘর একটা সকলেরই মনে মনে থাকে। মাঝে মাঝে সেখানে ফিরে না গেলে উপায় নেই।

আজ তবে সময় হয়েছে। বাড়ী বেচে দিয়ে শিববাবু চলে গিয়েছেন মুসৌরী···আর ফিরবেন না। সেদিন যে-সব মানুষের জীবনের তারগুলো জড়িয়ে গিয়ে নানা সুরের এক আবর্ত রচনা করেছিল, তাদের মধ্যে কেউ-ই নেই। রাজকন্যা ইন্দুমতী বহুদিন হল চলে গিয়েছেন পরপারে। বাকি রইল বাহার। মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ

বছরের ব্যবধানেই বাহারের নামটা মানুষের স্মৃতিতেও মিলিয়ে গিয়েছে বললেই চলে। তার রূপের কথা অবশ্য আজও কেউ কেউ বলেন। বাহার শুধু রূপসী ছিল না, তার মধ্যে ছিল সেই যৌবনের প্রসাদ, যা তাকে প্রাণবন্ত করেছিল। সেইজন্য তার গানও ছিল বিশেষ করে প্রাণময়। বাহার বাঈয়ের গান যাঁরা শুনেছিলেন ১৯২৪ সালে শ্রীনটপুরের রাজবাড়ীতে ইন্দুমতীর বিয়ের জলসায়—তাঁরা কে কোথায় আছেন জানি না। বাহারের সম্বন্ধে শিববাবু বলেছিলেন—

'অপনাহি প্রেম তরুবর বাড়ল
কারণ কিছু নাহি ভেলা।
শাখা পল্লব কুসুমে বেয়াপল
সৌরভ দশদিশ গেলা॥'

অর্থাৎ বাহারের রূপ, যৌবন ও লাস্য ছিল একান্তই স্বভাব-সঞ্জাত। হীরের মতো আপন স্বভাবের নিয়মেই বিদ্যুৎপ্রভ দ্যুতি বিকিরণ করতো সে। মানুষ সেটা বুঝত না বলে এতো নিন্দা-প্রশংসা করতো। এ কথা বলেই শিববাবু বলতেন—তার সম্পর্কে আমার একমাত্র স্মৃতিকে যদি কথায় বলতে হয়, তো আমি বলব—

'একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা'...

এই কথা বললে যে গভীর বেদনার মূর্ত নারীরূপ মনে আসে তা-ই। আমি তাকে অন্যভাবে দেখিনি।

বাহারের সম্বন্ধে আমার ধারণা শিববাবুর মতোই পরম শ্রদ্ধায় সমুজ্জ্বল। সে-ও আনন্দের কথা ভেবে।

এ কাহিনী লিখতে বসে একবার চোখের দেখা দেখতে গেলাম শ্রীনটপুরের রাজবাড়ীটা। যে বাড়ী আনন্দের জীবনের বারোটা বছরের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার সাক্ষী। ইতিমধ্যেই মাড়োয়ারী কোম্পানির প্ল্যাকার্ড পড়েছে সামনে। কনট্রাক্টর ঘোরাফেরা করছে।

ভেঙেচুরে ফেলে একেবারে নতুন ঢঙের একখানা দশতলা বাড়ী উঠবে। শহর কলকাতা ধীরে ধীরে চেহারা বদলাচ্ছে।

আর কাশীতে নেমিচাঁদের গলির সেই বাড়ীখানা? ওপরের কামরাখানা একবার দেখতে চেয়েছিলাম নতুন মালিকের কাছে। সে বললো—তিনখানা ঘর ভেঙে একখানা হল্ বানিয়ে আমি ছাপাখানা বসিয়েছি। কি দেখবে বাবু?

সত্যি কথা। জবাব আসেনি মুখে। চলে এসেছি।

আব আমার দেখা-না-দেখার সঙ্গে তো কাহিনীর কোন যোগ নেই। এ কাহিনীতে আমার কোন ভূমিকাই নেই। আমি শুধু সূত্রধার।

॥ এক ॥

কাহিনীর শুরুও কিন্তু বেনারসেই। সে ১৯১১ কি ১৯১২ সাল হবে। হরিদ্বার ও হৃষিকেশ ঘুরে কলকাতা ফেরবার মুখে কাশীতে নেমেছেন দয়ালদাস মিত্র। সূর্যবাবুর আতিথ্যে আছেন হরিশঘাটে। গোধূলিয়াতে গণেশরাম ভূপৎরামদের বাড়ীতে খুব জোর আসর হয়ে গেল।

গণেশরামজী তাঁকে বলেছেন—দয়ালবাবু, যদি সুযোগ হয়ে যায় তো আপনাকে আমি একটা আশ্চর্য জিনিস শোনাব। তবে সুবিধা মেলা চাই।

কৌতূহলী হয়ে আছেন দয়ালদাস। তাঁর গুরুজীর ভাই হচ্ছেন গণেশরাম। শৌখিন মানুষ। সঙ্গীতের বড় অনুরাগী ভক্ত। শৈশবের বন্ধু তাঁরা। একই স্কুল থেকে পালিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে তাঁরা এক সন্ন্যাসীব চেলা হয়ে হিমালয়ে চলে যাবার ঠিক করেছিলেন। যৌবনে গান শোনবার লোভে বাঈজীদের মহালে সন্ধান করে ফিরেছেন একসঙ্গে। তিরিশ বছরের পবিচয়। বন্ধুত্বটা সুখদুঃখের রোদ-বিষ্টিতে জারিয়েছে খুব। প্রথম উচ্ছ্বাসের ফেনা থিতিয়ে গিয়েছে। এখন বেশ মেজাজী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সম্বন্ধটা।

কিন্তু কী চমৎকার গাইলো পুণার ছেলেটি!—'বে গুণা গুণা গাওয়ে—'। গাইবার ভঙ্গীটিও সুন্দব।

টাঙ্গার ঘোড়ার পায়ে মাঝরাতের বেনারসের পাথুরে রাস্তায় শব্দ উঠছে টকাস-টকাস করে। পাথরের তিনতলা বাড়ীগুলো দুইপাশে ঝিমুচ্ছে। অনেক ওপরে তাকালে চোখ পড়বে দুপাশের বাড়ীর ছাতে ছাতে পাথরের সেতু বেঁধে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

নিচের দিকটা অন্ধকার। কোন বাড়ীর 'চোরমহলা'র সিঁড়ি নেমে গিয়েছে পথের থেকে নিচের দিকে। শহরটা ঘুমিয়েছে কি ? পুরোনো শহর—অনেক পুরোনো পাপও এখানে বাসা করে আছে। রাত বাড়লে তারা বেরিয়ে এসে চলে-ফিরে বেড়ায়। তাই কানে আসে কোন বাড়ীর চোরাকুঠুরি থেকে জুয়াড়ীদের হল্লা, সুবেশ ধনীদের সতর্ক চলাফেরা চোখে পড়ে ক্বচিৎ। কখনো স্ত্রীলোক নিয়ে হল্লা করতে করতে গাড়ী-বোঝাই মানুষ চলে যায়। চোখ মেলে ছাখে আর কান পেতে শোনে বুড়ো শহরটা।

শিবালা-ঘাটের কাছে এসে টাঙ্গা ছেড়ে দিলেন দয়ালদাস। গলি-পথে ভেসে আসে গঙ্গাতীরের শীতল বাতাস। হরিশ্চন্দ্র-ঘাট থেকে শবদাহের তীব্র গন্ধ আর নিমফুলের মিঠে গন্ধ একই সঙ্গে বয়ে আসে সেই বাতাসে।

সূর্যবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীখানার গা দিয়ে উঠেছে একটা চাঁপাগাছ। পরিষ্কার বিছানার পাশে চৌকিতে কালো পাথরবাটিতে জলে ভেজা গুটিকয় চাঁপাফুল থেকে গন্ধ আসছে। জানলার পাশে চৌকি নিয়ে বসলেন দয়ালদাস।

সহসা নৈশ নীরবতা গুঞ্জরিত করে ভেসে এল বড় মধুর সুরের রণিত একটা ছোট্ট ঢেউ। কৌতূহলী হলেন দয়ালদাস। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল গান। তাঁর মনের পর্দাতেও সাড়া জাগল। পরিচিত গান—পরিচিত সুর। 'য়ো রঙ্গবালে বলমঁা—'। এই কাশীতেই আখ্‌তারী বাঈয়ের ঘরে বসে একদিন তিনি শুনে গিয়েছেন এই গান। সে বছর-দুয়েক আগে। বুড়ো বয়েসেও নাতনী চতুরাণের সঙ্গে মস্করা ক'রে টেক্কা দিয়ে কী চমৎকার যে গাইল আখ্‌তারী! বললো—মাস্টারবাবু, তোমার বাবাকে যখন গান শুনিয়েছি নেহাল-চাঁদজীর বাগানবাড়ীতে, তখন আখ্‌তারকে দেখে দেখে লোকে গান শুনতে ভুলে যেত। এখন চেহারায় ঘুণ ধরেছে, বয়স হয়েছে, তাই

বসে কান পেতে গানটাই শোনে মানুষ, রূপ আর দেখে না। তান-কর্তবের ভুলচুক যদি কানে বাজে, তো হেসে তাকে উপেক্ষা করে যেয়ো।

টাকা নিল না। বরঞ্চ শরবত তামাক খাইয়ে দিল।

কিন্তু সেই গান এমন ক'রে কে গায় এত রাতে! সূত্‌ ও মীড়ের এই অপূর্ব কারুকাজ আর গানের চরণ ভর করে সুরের বিহঙ্গের এই মনোরম স্বচ্ছন্দ বিহার সম্ভব হয় কেমন করে?

তাঁর পাশে অজান্‌তে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন সূর্যবাবু, দেখতে পাননি দয়ালদাস। সূর্যবাবু বললেন—শুনলে?

—শুনলাম। কে গাইছে বল তো?

—কালকে চাক্ষুষ দেখাব। পরিচয় শুনবে? চোদ্দবছরের ছেলে। বাপ-মা নেই। বলে তো আগ্রার মানুষ। মোট কথা, একেবারে রাস্তার ছেলে—কিন্তু কি জান দয়াল, এরকম আশ্চর্য ঘটনা আমি দেখিনি। সাধনা নেই, শিক্ষা নেই। মিঠাইওয়ালা, জুয়ার আড্ডাদার, এদের দয়াতে ছুটো খায় আর ঘাটে প'ড়ে থাকে রাত্তিরে, কিন্তু ছেলেটা গান করে ঐরকম।. প্রথম ওকে দেখেছিলাম আমি অসিঘাটে। মারাঠী কোন্‌ সন্ত্‌জীর গান শুনে শুনে, সেটি সে সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে গাইছে ঘাটে ব'সে। গান শুনে পয়সা দিলাম আমি, তা বলে কি না, পয়সা দিয়ে কি হবে, ওর বড় শখ, কিছু রাবড়ী খাবে। খাওয়ালাম দোকানে নিয়ে। বললাম, চল্‌ তোকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাই। থাকবি, গান শিখবি। বিশ্বাস করল না। বললো, ওকে ধ'রে গান গাইয়ে পয়সা কামিয়ে নিয়েছে কোন্‌ জওয়ালা-প্রসাদ। আখ্‌তারীর বাড়ীর সামনে রোজ যেত ও, গান শোনবার লোভে। একদিন রাস্তায় বসে আখ্‌তারীর গানই গেয়ে আখ্‌তারীকে তাক লাগিয়ে দিল। ওকে ওপরে ডেকে নিয়ে হাত ভরে টাকা দিল আখ্‌তারী—হাত ধ'রে বললো—শুধু কানে শুনে গান চুরি

ক'রে নিয়েছে ও, দেখে বড় ভয় পেয়েছে আখ্তারী। মনে হচ্ছে হয় সে জুয়াচোর, নয় কোন বিরাট প্রতিভা। তাই অনুরোধ করছে, আখ্তারীর শ্রবণের পাল্লা ছাড়িয়ে যেন সে চলে যায়। বললো—বাবু, আমি গান শুনি আর গলায় আমার এসে যায় গান—তা না বুঝেই বাঈ আমাকে তাড়িয়ে দিল। তোমার বাড়ী যাব বলে কথা দেব কেন? তুমি যদি দু'দিন বাদে ভাগিয়ে দাও?

এদিকে ছেলেটা জাত-বৈরাগী। কোন জিনিসে আকর্ষণ নেই। কাশীর ঘাটে-ঘাটে ঘুরবে, জুয়ার আড্ডায় বসে গান শোনাবে জুয়াড়ীদের—ও এক আজব ছেলে। বল, সাধনা বিনা এমন গান শুনেছ কোথাও?

—আমাকে দেখাতে পার সূর্য?

—নিশ্চয়। কাল ভোরেই পাঠাব কাউকে—ধরে আনবে ঘাট থেকে।

ভোর হবার অপেক্ষায় ঘুম হল না দয়ালদাসের। পিতার মৃত্যুর পর পিতারই পদ নিয়ে শ্রীনটপুরের বাড়ীতে শিক্ষক হয়ে আছেন তিনি। অনেক ইচ্ছাতেও সঙ্গীত শোনার নেশা, গান গাইবার পেশা হয়ে ওঠেনি। তবু সঙ্গীত-প্রেমিক মানুষ তিনি। এই রকম প্রতিভা পথেঘাটে বাঈজী-মহল্লা আর জুয়াড়ীদের আড্ডায় গান শুনিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, সে কি সহ্য হয়?

সকালবেলাই এল ছেলেটি। সরল সুন্দর মুখশ্রী, শ্যামবর্ণ, বড় বড় চুল। ময়লা ও জীর্ণ যোধপুরী ও ঘুনসি-দেওয়া পাঞ্জাবি পরা। সলাজ হেসে মাটিতে বসল।

—তোমার নাম কি?

—আনন্দ।

—বাবা-মা কোথায়?

ওপরের দিকে হাত দেখাল বালক।

—আমার সঙ্গে যাবে ?

—কোথায় ?

—কলকাতা।

—কেন ?

—আমি তোমাকে গান শেখাব, আনন্দ। ওস্তাদ দেব তোমাকে।

—গান শুনতে পাব সেখানে ?

—হ্যাঁ, আনন্দ।

—কলকাতা কি বড় জায়গা ?

—কাশীর চেয়ে অনেক বড়।

তখন হেসে আনন্দ বললো—হ্যাঁ, যাব। কিন্তু টাকাপয়সা ? আমার তো কিছু নেই, বাবুজী। কাল পূজা ছিল চতুবাণ বাঈজীব ঘবে। কাপড় দিয়েছিল কুর্তা বানাতে।

—কি হল ?

মাথা চুলকে আনন্দ বললো—মিঠাইএর দোকানে ধাব করে খেয়েছিলাম ইয়ারদের সঙ্গে। ছেদীলাল তাই কাপড়খানা নিয়ে নিল। বললো, পথেঘাটে থাকবি, চিকনের কুর্তা প'রে তোর হবে কি ? আমিও বললাম—ঠিক বাৎ।

ব'লে হাসতে লাগল আনন্দ। বললো—সেইজন্যে আমিও চালাক হয়ে গিয়েছি। কি গণেশ-মহাল, কি সোনেরাপট্টি, সব জায়গায় আমাকে গান গাইতে নিয়ে যায়, খুব গান গাই···দম চলে যায়, ব্যথা উঠে যায়, কলিজা পাকড়ে ধরে, তবু গান ছাড়ি না। কিন্তু পয়সা-টাকা নিই না, বাবুজী—বলি, টাকাপয়সা বড় খারাপ জিনিস—পাঁচটা টাকাব জন্যে চাকু চালিয়ে দেবে পিঠে কোন্ বদ্‌মাস—আমাকে শুধু পুরি-মালাই খাইয়ে দাও।

দয়ালদাস কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন—জামা ও যোধপুরী বানিয়ে দিলেন একটা, পায়ে জুতো

কিনে দিলেন, মাথায় দিলেন টুপি। সূর্যবাবু বললেন—চিরকালটা পাগলামি ক'রেই গেল তোমার। আচ্ছা, বলতে পারো, কি করবে ছেলেটাকে নিয়ে ?

—বলতে পারি না। তবে আমি তো নিমিত্ত মাত্র। কলকাতায় নিয়ে পৌঁছে দেব জমীর খাঁ সাহেবের কাছে। বলা যায় কি, হয়তো একদিন এই ছেলেই বড় হয়ে নাম রাখবে ওস্তাদের।

*

শ্রীনটপুরের বাড়ীতে যখন গাড়ী ঢুকল, তখন ছুটে এল দাবোয়ানরা। দরজা খুলে ধরে বললো—এবার অনেকদিন বাদে এলেন মাস্টারবাবু।

দোতলার পশ্চিমমুখী বৈঠকখানায় ফরাসে বসে ছিলেন মহারাজা যোগীশ্বর রায়। একপাশে ছোট্ট ছেলে শিব, আর একপাশে আটবছরের মেয়ে ইন্দু বসে তাঁর গল্প শুনছিল। সেই সুসজ্জিত ঘর, টেবিলে ক্রোটন ও গোলাপের তোড়া, সৌম্যসুন্দরকান্তি গৃহস্বামী, তাঁর দুই পুত্রকন্যা—সবসুদ্ধ এমন একটি প্রশান্ত সুন্দর পরিবেশ হয়েছিল যে, সেই ছবিখানা আনন্দের মনে অনেকদিন অবধি আঁকা ছিল। অভিভূত ভাবে সে দাঁড়িয়েছিল একপাশে। দয়ালদাসের কথায় রাজাকে বুঝি প্রণামও করেছিল। রাজার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দয়ালদাস। মেয়েটি তাকে ডেকে নিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে ডেকে ডেকে কত ঘর-বারান্দা, সব পেরিয়ে নিয়ে গেল ছোট একটা ছাতে। সেখানে কাঠের বাক্সে ফুটেছে গোলাপ। কাঁচের চৌবাচ্চায় খেলা করছে মাছ, জাফরি-কাটা তোরণ ভ'রে ফুটেছে লবঙ্গলতার ফুল। মেয়েটি বলেছিল—তোমার নাম কি ? তুমি নাকি গান করতে পার ?

তার কথা বুঝলেও, বলতে পারেনি আনন্দ। মেয়েটি বলেছিল —ও, তুমি বেচারি বুঝি বাংলা জান না ? আমি কে জান তো ?

মাথা নেড়েছিল আনন্দ—সে জানে না।

—আমি হলাম রাজকুমারী ইন্দুমতী, বাবা আমাকে গিন্নী বলেন, মা বলেন খুকী। তুমি আমাকে ইন্দু বলেই ডেকো।

ইন্দু··· উচ্চারণ করেছিল আনন্দ। মনে হয়েছিল ভারী শ্রুতিমধুর কথাটা। আরো মনে হয়েছিল, তিনদিন আগে শিবালা-ঘাটে যে ছেলেটা বোবা ভিখিরীটার পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছিল, সে যেন আনন্দ নয়। তিনদিন আগে আর পরে দুনিয়াখানা এতখানি উল্‌টে যেতে পারে না। একটা সত্যি, আর একটা স্বপ্ন।

আর একটা সাক্ষাৎকাবের স্মৃতি তার মনে বড় গভীর রেখায় আঁকা হয়ে রইল। দয়ালদাস তাকে নিয়ে গেলেন বরানগরে—শ্রীনটপুরের বাগানবাড়ীতে। ঘোড়ার গাড়ী যখন শহব ছাড়িয়ে নিরালা পথ ধরল—দয়াল বললেন—আনন্দ, তোমাকে হিন্দুস্থানের একজন নামী ওস্তাদের কাছে নিয়ে চলেছি। যদি নসীবে থাকে তো থেকে যাবে তাঁর কাছে।

গেট চোখে পড়ে না, এমনই ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ। উঁচু পাঁচিল ঘেরা বিস্তীর্ণ জমির মধ্যে ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ী। ওপরে ও নীচে দুটি হল্ কামরা, পাশ দিয়ে একটি করে, দুপাশে দুটি কামরা। একটি দীঘি আছে। পাশে ফুলবাগান। বড় বড় গাছ-ই বেশী। বট, অশথ, দেওদার, নিম, ইউক্যালিপ্‌টাস, আমলকী, শিরীষ—গাছের গোড়ায় গোড়ায় বাঁধানো বেদী। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোহার চেয়ার ও বেঞ্চি। দুজন মালী একমনে ঘাস ছাঁটছে।

ওস্তাদ বসে ছিলেন ঋজু হয়ে, শুক্লকেশ শুক্লবেশ তাঁর। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দয়ালকে দেখে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন—আনন্দ মাটিতে শুয়ে প'ড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবল। দয়াল বললেন—ওস্তাদ, কাশীতে ঘাটে ঘাটে ঘুরে ফিরছিল—এ একজন

গুণী ছেলে—গান শেখেনি, সুরের নাম জানে না, অথচ গান করে শুদ্ধ রাগ তাল লয় ঠিক রেখে। শ্রুতিমাত্রেই গান শিখে নেয়।

আরো অনেক কথা বলেছিলেন তিনি। নতজানু হয়ে ওস্তাদের পাশে ব'সে। শুনতে-শুনতে অল্প অল্প মাথা নাড়ছিলেন ওস্তাদ। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

উঠে এলেন দয়ালদাস। বেরিয়ে গেল আর যারা ঘরে ছিল। আনন্দকে কাছে ডাকলেন ওস্তাদ।

কাছে গেল আনন্দ—করজোড়ে দাঁড়াল। ওস্তাদ বললেন—কাছে এসো, বেটা।

পুত্র-সম্বোধনেও ভয় কাটল না মনে। কাছে গেল আনন্দ। তার চিবুক তুলে মুখ চোখ দেখলেন ওস্তাদ। নিরীক্ষণ ক'রে দেখে দেখে বৃদ্ধের ক্ষীণদৃষ্টি চোখে জল ভ'রে এল। বললেন—অমর্যাদা কোরোনা, বেইমানি ক'রে চলে যেয়োনা—শিখবার আগেই বেচতে শুরু কোরোনা।

অভিভূত আনন্দ মাথা নাড়ল। সহসা সাদা কামিজের ভেতর থেকে মালা তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকালেন ওস্তাদ। স্বগতোক্তিতে কোন মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। বললেন—আমার যৌবনে দেখেছিলাম একজনের মধ্যে সঙ্গীত-সংসিদ্ধির একটি স্ফুলিঙ্গ—সে যুবক নিজেকে জ্বালিয়ে দিল, ছাই হয়ে বাতিল হয়ে গেল অল্পবয়সে! বুঝি তার কাছে ঋণশোধ করবার সুযোগ আমাকে দিচ্ছেন ঈশ্বর—তাই শেষজীবনে তোমাকে আবার এনে দিলেন এখানে। আমি তো সামান্য মানুষ—আমাকে দিয়ে তাঁর কাজ যদি কিছু হয়, তো তাই হোক···আমি বাধা দেব না।

পরে উত্তরজীবনে ঘূর্ণিবাতাসের মতো সৃষ্টিছাড়া নিয়মছাড়া গতিতে ঘুরতে ঘুরতে আনন্দ ওস্তাদের উল্লিখিত মানুষটির নাম শুনেছিল। শুনেছিল, তিনি মইহারের সুজা খাঁ। স্বল্পদিনের জন্য ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উদিত হয়ে উল্কার মতো কক্ষভ্রষ্ট হয়ে জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছেন তিনি।

॥ দুই ॥

নতুন জীবনে অভ্যস্ত হ'তে প্রথমটা বড় অসুবিধে হয় আনন্দের। খাঁ-সাহেবের কড়া নিয়ম। অতীব প্রত্যূষে উঠে তিনি নিজেই বসেন রেওয়াজে। আনন্দকেও বসতে হয়। রোদ ওঠে। বেলা বাড়ে। আনন্দর ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ। সূর্যের আলো আসে না। গানের অভ্যাস শেষ হ'তে-না-হ'তে আসেন দয়ালদাস। এই বয়সে লেখাপড়া শুরু করাতে যথেষ্ট আপত্তি করেছে আনন্দ। শেষকালে খাঁ-সাহেবের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হয়েছে যে—অঙ্ক ভূগোল ইতিহাস থাক, মোটামুটি বাংলা জানলেই যথেষ্ট। দয়ালদাসের নিজস্ব একটা থিওরি আছে। অঙ্ক দিয়েই নাকি বিশ্বসংসার চলেছে। সূর্য চন্দ্র থেকে শুরু করে দুনিয়ায় এমন কিছুই নেই যার মধ্যে অঙ্ক নেই। খাঁ-সাহেব তাঁর কথা শুনেছেন নীরব প্রতিবাদের সঙ্গে। পরে কথায়-বার্তায় মহারাজকে বলেছেন—বাংলাপান চিবিয়ে আর নস্যি নিয়ে দয়ালদাসের মগজেও নস্যি পৌঁছে গিয়েছে। বলে কিনা সব-কিছুর মধ্যে অঙ্ক রয়েছে। সবাই কি ওর মতো মাস্টার হবে? যে অঙ্ক শিখবে? আমাকেও তো আমার মা পৌঁছে দিত মখ্‌তবে—আমিও মৌলভীকে ধোঁকা দিয়ে পালাতাম—তাতে আমার কোন্ মুশকিল হয়েছে?

যোগীশ্বর হেসেছেন। সকলের মধ্যে মহারাজ যে একজন মানুষের মতোই মানুষ, তাতে আনন্দর এতটুকু সন্দেহ থাকেনি। মাঝে-মাঝেই ইন্দু আর শিবকে নিয়ে ঝুড়ি-ভর্তি খাবার বোঝাই দিয়ে ফিটন হাঁকিয়ে এসেছেন যোগীশ্বর। সেদিন সকলেরই হয়েছে ছুটির দিন। ফিটন করে আরো মানুষজন এসেছেন। রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছে। পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরেছেন বড়রা। ইন্দু আর শিবকে গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে দিয়েছে আনন্দ। যোগীশ্বর

সেইসব সময়ে গুল্‌তি ছুড়তে, টোপ ফেলে মাছ ধরতে, তাক করে ঢিল ছুড়ে কুল পাড়তে আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বলেছেন —তোর মতো আমিও ছিলুম পথঘাটের ছেলে। আমাকে এরা ধরে এনে গদীতে বসিয়েছে, জান্‌লি ?

কোনদিন দেখা গিয়েছে ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে শিবকে এনেছেন তিনি। তাঁর অনুরোধে আনন্দ হঠাৎ ছুটি পেয়ে গেছে। তার পর ঘুড়ি-সূতো নিয়ে মাঠে শিবের সঙ্গে ছুটোছুটি করেছে আনন্দ। চীৎকার করে গান করেছে, বারান্দায় বসে সেই গান শুনতে শুনতে খাঁ-সাহেব ভ্রূকুটি করেছেন। বলেছেন—বেনারসের মণ্ডি মাতাচ্ছে নাকি ? গিধোড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছে যে ?

মহারাজ কিন্তু সস্নেহ প্রশ্রয়ে হেসেছেন। আনন্দকে ডেকে কাছে বসিয়ে বলেছেন—বেটা, গান শুনিয়ে দে, তোকে যে ছুটি মিলিয়ে দিলাম তার বকশিশ !

তাঁর পায়ের কাছে বসে আনন্দ গেয়েছে—'শঙ্করশিব-জটাবাসিনী জাহ্নবী'। কিশোর-কণ্ঠের সেই সুমধুর বন্দনা শুনতে শুনতে যোগীশ্বর শিবের মাথায় মৃদু মৃদু টোকা মেরেছেন অন্যমনস্কভাবে।

বাড়ী ফিরতে সরযূ বলেছেন—শিবকে তুমি এমন করে মিশতে দাও আনন্দর সঙ্গে—এতটা কি ভালো ? হাজার হলেও ওর জাত, ঘর···

—খুব ভালো সরযূ, তুমি কিছু বোঝ না। আমিও তো কোন্ গণ্ডগ্রামের পুরুত-বামুনের গরীব ছেলে,—তাহলে তোমাদেরও উচিত নয় আমার সঙ্গে মেশা, বল ?

এ কথার জবাবে সরযূ হার স্বীকার করেছেন। আনন্দকে যোগীশ্বর এতখানি সহজ অধিকার যে দিয়েছেন তারও কারণ আছে। গরীব ঘরের ছেলে তিনি নিজে—রাজার পুষ্যি হয়ে এসেছিলেন রাজবাড়ীতে। বুড়ো বটগাছটার ঝুরি ধরে দোল খেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে

পড়া, দাদার সঙ্গে মাছ ধরবার ছিপ-বঁড়শি নিয়ে বিলের ধারে দিন কাটানো, মাঘ মাসের ভোর রাতে শিশির-ভেজা ঘাসে পা ফেলে সরস্বতীপুজোর ফুল তোলা,—এই সব নিয়ে যে শৈশবটা তাঁর কাছে অতিমধুর অতিপ্রিয় ছিল, রাজবাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যে তাকে আর পাননি যোগীশ্বর। পালকি চড়ে পাইক-পেয়াদার সঙ্গে সিল্কের জামাজোড়া প'রে কেঁদে-কেটে রাজা হ'তে এল যে-ছেলেটা, তার মর্মবেদনার স্মৃতি আজও যোগীশ্বর ভোলেননি। আনন্দের মধ্যে নিজের সেই বাল্যজীবনেব ছবিখানা দেখতে পান যোগীশ্বর। বাইরে যখন পুকুরের জলে বাঁশগাছের ছায়া ঝিলমিল করছে, সকালের রোদে নীল আকাশখানা ঝকঝক করছে—তখন জোর করে বসে পড়া তৈরি করবার দুঃখটা তিনি জানেন। তাই আনন্দকে প্রশ্রয় দেন তিনি। তার অল্পবয়সের দিনগুলো যেন ভারাক্রান্ত হয়ে না ওঠে, সে দিকে নজর রাখেন। শুধু সরযূ নন, খাঁ-সাহেবও মাঝে মাঝে আপত্তি করেন। তখন যোগীশ্বর বলেন—খাঁ-সাহেব, পুরো দুনিয়াটারই যে মালিক হয়ে এসেছে, তাকে আপনি কত বাঁধবেন বলুন? ওর মতো পথঘাটের মানুষ যারা, তারা তো দুনিয়াটাকেই কিনে নিয়েছে। চার দেয়ালের মধ্যে শুতে কেমন লাগে তা জন্মে জানে না—তাই বলি মাঝে মাঝে ওকে ছেড়ে দেবেন।

জমীর খাঁ বলেন—আমি বুঝি। কিন্তু কি জান, কেমন যেন মনে হয় আমার আর সময় মিলবে না। আনন্দকে পেলাম একেবারে শেষবয়সে। আমার এখন 'জ্যোত বিনা নৈনা'। তাই মনে হয়, আমার যত বিদ্যা আছে একে দিয়ে যাই। যোগীশ্বর, আমাকে আমার গুরুজী বলতেন—গুরু অনেক মিলবে, যোগ্য শিষ্য মেলা ভারী কঠিন। সে কথা ভারী সত্যি। এখন এই শেষবয়সে আনন্দের মতো যোগ্য শিষ্য পেলাম যদি, মনে নানারকম ভয়···

—কি ভয় খাঁ-সাহেব ?

গলা নামিয়ে খাঁ-সাহেব বলেছেন—ভয় কি জান ? আমার জীবনে আমি যত মানুষ দেখেছি, তাতে এই শিখেছি যে, এক-একটা মানুষ জন্মেছে কপালে বাদল-বাতাস নিয়ে। তাদের কপাল-ই তাদের স্থির থাকতে দেয় না। এসব মানুষ ভালবাসা পায় অনেক, কিন্তু রাখতে পারে না। হাতের লক্ষ্মী এরা ফেলে দেয় যোগীশ্বর, কোন বে-দিশা নসীবের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমার বড় ভয় করে যোগীশ্বর, ছেলেটার মধ্যে আমি যেন সেইসব দেখতে পাই !

সে কথা হয়তো সত্যি। সবরকম বাঁধনকে অস্বীকার করবার একটা দুরন্ত তাগিদ আনন্দর ভেতরে আছে। তা ছাড়াও আছে হাজারটা ইচ্ছে। অনেক রকম ইচ্ছে তার হয়, দুনিয়ার লোকে যদি বলে সেগুলো অদ্ভুত, তাহলে সে কি করবে ! মহারাজের বকশিশ দশটাকা দিয়ে পাখী কিনে সে ছেড়ে দেয়। পাথরের বেঞ্চিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঠপিঁপড়ের জীবনযাত্রা দেখে। পদ্মফুল কখন ফুটবে দেখবার জন্যে ভোর রাতে গিয়ে বসে থাকে পুকুরপাড়ে। ভগবানকে দেখতে পাবে, এই প্রলোভনে ভুলে একটা সাধুর পেছনে সে অনেকদিন ঘুরল। বাগানবাড়ীর বাইরে এসে শুয়ে ছিল লোকটা। বুড়ো হয়ে গিয়েছে, গেরুয়া-বসন জীর্ণ। দেখে, আনন্দর মনে ভক্তির চেয়ে কৌতূহলটা বেশী দেখা দিল। বেনারসের জীবনে সাধু-সন্ন্যাসী সে অনেক দেখেছে। অনেকেই যে ব্যবসাদার ছাড়া কিছু নয়, তা-ও সে জানে। তবে এঁকে কথাবার্তা কওয়ানোই দায়। একে জটিয়াবাবা, তাতে মৌনী—হয়তো অদ্ভুত সব ক্ষমতার অধিকারী ইনি, হয়-কে নয় করতে পারেন। ওস্তাদের কড়া নজর এড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আনন্দ সাধুকে রুটি-ডাল খাওয়াল। সাধুজীর নোংরা পা-দুখানাই দাবাল

দুপুর-ভর। সাধু প্রসন্ন হলেন তিন-দিনের-দিন। বললেন—নাম কি তোমার বেটা ?

—আনন্দ।

বড় খুশী হলেন সাধু। বললেন—বড় সুন্দর নাম। আনন্দর কৌতূহল অপরিসীম। সাধুজী এসেছেন অমরনাথ থেকে। বছরের মধ্যে নয় মাস-ই যেখানে বরফ জমে রাস্তা বন্ধ থাকে। সেখানে বাবা অমরনাথকে দেখে এসেছেন সাধুজী। এই লোকটা অত দূরের পথে গিয়েছিল তাই জেনে ভক্তি হল আনন্দর। তারপর সাধুজী তাকে বললেন নির্জনে বসে ধেয়ান করলে ভগবানকে দেখা যায়। ভগবানের সম্বন্ধে তাঁকে খুবই ওয়াকিবহাল মনে হল। আরো বললেন কি,—'যত সাধনা ছিল, সব আমি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে নষ্ট করেছি। চল্লিশ বছর ধবে যে সাধনা করেছি, তিন মাসে তা নষ্ট করেছি। আবার নতুন করে সাধনা করছি, বুঝলে ?' বলতে বলতে সাধুব চোখ জলে ভিজে এল। বললেন—'কোথায় অমরনাথ, কেদারেশ্বর, জ্বালামুখী—ঘুরে ঘুরে সাধুসঙ্গ করে যতটুকু যা পেয়েছিলাম বেটা, সব আমার হারিয়ে গেল ! মেলায় বসে একটা ছেলের অসুখ সারালাম। সবাই "জয় জয়" দিল। আরো মানুষ ভীড় করে এল। আমি নিজেকে ভুলে গেলাম। তারপর·· নিজের অহঙ্কারেই আমার পতন হল। সব আমার হাবিয়ে গেল··· ।' আনন্দর বড় কষ্ট হল সাধুর হতাশ মুখ দেখে। সাধু আরো বললেন —'তোমার মন আর চঞ্চল করব না বেটা, আমি চলে যাব।'

—কোথায় যাবেন ?

—যেদিকে দু'চোখ যায়।

তারপর সস্নেহে বললেন—তুমি গৃহী। তুমি বুঝবে না যে তোমার মতো কিশোর বালকের স্নেহভক্তি আমার পক্ষে শিকলের সমান। আমি তো শিকল ভেঙেই বেরিয়েছি। আবার কেন জড়াবো ?

আমি চলে যাব। তুমি বড় ভালো ছেলে, আনন্দ। আমি আশীর্বাদ করবার অধিকারী নই। আমি শুধু কামনা করছি যে, তুমি যেন চিরদিন আনন্দে থাকো। আনন্দে রহো সদা কাল···আনন্দে রহো সদা কাল।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সাধুজী চলে গেলেন। যাবার সময় আনন্দর মনটিও হরণ করে গেলেন। সন্ধ্যার মুখে, কুয়াশাচ্ছন্ন পথ ধরে জীর্ণদেহ সাধুজী ক্লান্ত ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছেন দেখে আনন্দর মনে এমন দুঃখ হল যে বলবার কথা নয়। নির্ঘাত সে চলে যেত, যদি না ওস্তাদ স্বয়ং এসে তাকে ধরতেন। তার দুঃখ বুঝেই যেন কিছু বললেন না ওস্তাদ। সমব্যথীব মতো পিঠে হাত বোলালেন। ঘরে এসেও আনন্দ উদাস হয়ে আছে দেখে কাছে ডাকলেন। বললেন—বোস্। ওস্তাদের কাছে প্রকাশ্যে স্নেহের সম্ভাষণ শোনা একটা অভিজ্ঞতা। আশ্চর্য হয়ে আনন্দ কাছে এল। পুরোনো একটা সাদা পাথরের বাক্স থেকে বের করে আঙুর খেতে দিলেন ওস্তাদ। বললেন—বোস্। একটা কিস্‌সা শোন্। শোন্, তোর মতো বয়সে আমি যখন ওস্তাদ ধরলাম, আমারও সুবুদ্ধি ছিল না। ঘরের চেয়ে পথই ভালো লাগতো। ছ্যাখ্, যার যা-নসীব, সে তা-ই করে। ও লোকটার নসীবে পথ লেখা আছে তাই ও ঘুরে ঘুরে মরছে। তোর নসীবে যদি পথ-ই লেখা থাকে তো তুই-ও ঘুরবি। তবে ঘুরবি রাজার মতো, ফকিরের মতো নয়। দুনিয়ার লোক বলবে যে, হাঁ, জমীর খাঁ শিখিয়েছিল বটে ছেলেটাকে! মানুষের মতো মানুষ করেছে একখানা। আরে পাগল, দুনিয়াতে তুই কি শুধু খেতে, ঘুমোতে আর ঘুরতে এসেছিস? ঈশ্বর দিচ্ছেন তাই খাচ্ছিস। তাঁর নিমক খেয়ে তাঁর কাজ কর্ একটা কিছু? দুনিয়াতে নিজের নাম জাহির করে যা। তোর কণ্ঠ আছে, তুই গান কর্। সাধনা কি ভগবানকে নিয়েই হয়? গানও ভগবানের মতোই সাধনার জিনিস। তুই তো দুধের বালক—সাধক বৈজু,

সদারঙ্গ এঁদের জীবন তো জানিস্ না। শোন্, সাধনা কি রকম হয়। এক হাত লম্বা আর এই চওড়া মোমবাতি মেঝেতে বসিয়ে দিয়ে যেতেন ওস্তাদ। সে বাতি জ্বলে-জ্বলে নিভতে চারঘণ্টা লাগত। যতক্ষণ বাতি জ্বলত রেওয়াজ করতাম—মাঝরাতে উঠে। আরো কিস্‌সা শুনবি ?

শুনতে শুনতে শান্ত হল আনন্দ। সে রাতে আনন্দর বিছানা হল ওস্তাদের পাশেই। রাতে শুয়ে ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। ঘুমের মধ্যে শুধু পথের স্বপ্নই দেখল সে। পথের পর পথ চলেছে। কত যে পথ আছে কে তা জানে! যে পথ দিয়ে চলেছে আনন্দ। তার একপাশে ঝাউগাছেব বন। ওপাশে সমুদ্র আছে। তার শোঁ-শোঁ ডাক শোনা যাচ্ছে। আবছা আঁধার। আনন্দ চলেছে তো চলেছে-ই। কতদূর যেতে হবে কে জানে! এদিকে মুখে চোখে সমুদ্রের বাতাস ঝাপ্‌টাচ্ছে।

এ কথা যোগীশ্বরের কানেও গিয়ে পৌঁছয়। তিনি অবশ্য মুখে কিছু বলেননি তাকে। শিবের জন্মদিনে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন আনন্দকে। নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আনন্দ গেল রাজবাড়ী। অনাথাশ্রমে ফল-মিষ্টি গেল এই শুভতিথি উপলক্ষে। রাজবাড়ীর বাগানে একজোড়া সাদা ময়ূর এল গুজরাট থেকে—মহারাজের উপহার। কাঙালী-ভোজন চলেছে—সন্ধ্যাবেলা বাজি পোড়াতে আসবে ঢাকার কারিগররা। সিল্কের পাঞ্জাবি-ধুতি প'রে কপালে চন্দনের ফোঁটা নিয়ে শিব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দরজার একটি পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল আনন্দ। মহারাজ তাকে ডাকলেন। বললেন—গান গা, আনন্দ।

পশ্চিম মহলের প্রান্তের এই ঘরখানিতে চন্দন-কাঠ ও হাতীর

দাঁতের কাজ-করা নিচু তক্তপোশ পাতা। হরিণের শিঙের ওপর পেতলের জয়পুরী ঢাকনা বসানো টেবিলে কাঁচের গোলাপদানে সাদা গোলাপ সাজানো। বারান্দার অর্কিডের সারিতে জল ছিটিয়ে দিয়েছে মালী। সাদা লেসের পর্দা দিয়ে বিচিত্র কারুকাজ রচনা করে রোদ এসে পড়ছে সবুজ মেঝেতে। মহারাজ বসেছেন স্মিতমুখে, চৌকিতে। ইন্দু হাসিমুখে বাবার কোলের কাছে বসল। ভাইয়ের জন্মদিনে শাড়ী পরেছে ইন্দু। মাথায় বেঁধেছে চওড়া রিবন। দুই হাতে মুক্তোর চুড়ি পরেছে। মাথা কাত করে হাসিমুখে চেয়ে আছে আনন্দর দিকে। একটু হাসল আনন্দ-ও। তার পর গান ধরল।—

'ভালবাস না বাস,
আমি তো বাসিব ভালো যাবত জীবন আশ।
যথায় তথায় থাকি
তোমা বিনে নহি সুখী,
বধিলে বধিতে পার—রাখিলে তোমার যশ।'

এ গানের সঙ্গে যোগীশ্বরের জীবনের কোন্ স্মৃতি জড়ানো তা কে জানে! চোখ মৃদু হয় মমতায়। বলেন—কলকাতায় থেকে থেকে বাঙালী হয়ে গেলি আনন্দ? তোর পুরোনো গান গা।

—সেই শঙ্কর-শিবের গান, আনন্দদা। ইন্দু বলে ওঠে। আনন্দ ঈষৎ হাসে। তারপর সুন্দর গম্ভীর কণ্ঠে গায়—

শঙ্করশিব ভৈরব আদি অনাদি দেব জয়।
গৌরীপতি মহাদেব জটা বিভূষণ জয়॥

গানের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কাশীতে অসিঘাটে বসে গাইছেন মহারাষ্ট্রীয় সন্তজী। মুগ্ধ হয়ে বসে শুনছে আনন্দ। শীতের তীব্র বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে, সিঁড়ির দুইপাশে ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীদের দান করতে করতে উঠে আসছেন কোন অভিজাত-বংশীয়া মহারাষ্ট্রীয়া রমণী। আনন্দের হাতে একটা আনি দিয়েছিলেন তিনি। সাধুর

সামনে নামিয়ে রেখেছিলেন একটি ডালা। তাঁর সর্বাঙ্গে হীরের গহনা—দান করছিলেন স্পর্শ বাঁচিয়ে। কেমন যেন একটা দম্ভের ভাব তাঁর মধ্যে ছিল। গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিলেন একবার। তার সঙ্গেই আনন্দের মনে পড়ল তাঁর পাশে একটি বৃহৎ পিতলের থালায় চাল ও পয়সা নিয়ে আসছিল যে মেয়েটি, তার কথা। বছর তেরো বয়স হবে। বিধবার চিহ্ন-স্বরূপ লাল রেশমের শাড়ী পরনে, মুণ্ডিত মস্তকে অবগুণ্ঠন। চোখের দৃষ্টিতে এমন কোন সরলতা ও বেদনার ছাপ ছিল যা সেদিনও আনন্দের মনে লেগেছিল। স্মৃতিচিত্রগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে রাগশ্রেষ্ঠ ভৈরব সুরের শিবস্তোত্র আনন্দের কিশোর-কণ্ঠে বাজে। মুগ্ধ হয়ে যান যোগীশ্বর। বলেন—বল্, কি পুরস্কার নিবি? আনন্দ আর ইন্দু চোখে চোখে হাসে। যোগীশ্বর পকেট থেকে বের করেন একটি রুপোর ডিবে। তাতে খোপে খোপে নানারকম এলাচ ও সুপুরি সাজানো। একমুঠো তুলে দেন। তারপর তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে আনন্দ। ইন্দু তাকে ডেকে নিয়ে যায়। বলে—চলো, আমার বাগান দেখবে।

পেছনের সিঁড়ি ধরে দুজনে বাগানে নামে। বাগানের এটা দুয়োরানীর মহল। ওপাশে নানারকম দেশী ফুলের গাছ। অন্তঃপুর-বাসিনীদের পুজো-আর্চা চলে। অনেকখানিই পড়ে আছে অনাদৃত হয়ে। বড় বড় অর্জুন আর বট গাছের ছায়ায় অন্ধকার সবুজ ঘাসে পা ফেলে চলে ইন্দু। বলে—একটা আশ্চর্য জায়গা আবিষ্কার করেছি জানো? শুধু তোমাকে দেখাব বলে—

রাজবাড়ীর প্রথম যুগে বোধহয় এখানে বেদী বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবহেলা ও অনাদরে সে বেদীর রং হয়েছে শ্যাওলায় সবুজ। সেখানেই বসে দুজনে। ইন্দু বলে—তুমি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছিলে?

—তোকে কে বললে ?

—শুনেছি।

—যাচ্ছিলাম-ই তো। তোদের কাছে বরাবর থাকতে দিবি নাকি ?

—গেলে না কেন ? বেশ হ'ত, বাবা লোক পাঠিয়ে ধরে আনতেন। শাস্তি হ'ত।

দুজনে চুপ করে বসে বটগাছের ঝুরি ধরে কাঠবিড়ালীর ওঠানামা দেখে। অদ্ভুত নির্জন ও নিঃশব্দ জায়গাটা। ইন্দু বলে—গুপ্ত একটা গুহা আছে এখানে জান ? বটগাছের গায়ের ফোকর একটা। তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ইন্দু বাদাম বের করে আনে। দুজনে ভেঙে ভেঙে খায়।

ইন্দুর সঙ্গে আনন্দের এই খোলাখুলি মেলামেশাকে খাঁ-সাহেব কিন্তু সব সময় অনুমোদন করেন না। বলেন—মালিক আর সেবক, তফাত একটা থাকবে না ? দীন দুনিয়ার মালিক যিনি, তিনিই এই তফাত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আজ আনন্দ বালক। তাই কোন তফাত সে বুঝছে না। বড় হলে দুনিয়া চোখে আঙুল দিয়ে তফাত বুঝিয়ে দেবে, তখন ?

আনন্দকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। ভবিষ্যৎ জীবনের ঝড়-ঝাপ্‌টাগুলি থেকে তাকে বাঁচতে শেখান। তাঁর্‌ কথাগুলি রূঢ় হলেও আন্তরিক। তাই বুঝে আনন্দ চুপ করে থাকে। কিন্তু সাতদিন যেতে-না-যেতেই মহারাজের খবর আসে। এবার নৌকোয় করে গঙ্গাবিহার।

এমনি করে কেটে যায় কৈশোরের দিনগুলো। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের দিনগুলি সুখস্বপ্নের মতো তপ্ত ও রোমাঞ্চকর। এ সময়ে সহসা মনে হয় আকাশ-বাতাস নিখিল জগৎ মহান প্রেমের

তরঙ্গদোলায় দোদুল্যমান। হৃদয়কে মনে হয় সীমাহীন, সুবিশাল। আনন্দের জীবনে এই সময়টি এসে যেন অনন্ত এক মণিকক্ষের চাবি খুলে দিয়ে তাকে হাত ধরে সেখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। যৌবনের রাজ-ঐশ্বর্য এমনই, যে এ-সময় ভিখারীও নিজেকে মহা ধনী মনে করে। মনের ভাষাহারা তরঙ্গ কণ্ঠে সুর হয়ে বাজল। এক প্রভাতে শিষ্যের কণ্ঠে 'পিয়া কো মিলন কী আশ' শুনে খাঁ-সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। বললেন—সাবাস বেটা! যোগিয়া রাগের রং আমার কল্পনায় গেরুয়া। তোমার গলায় অন্তরঙ্গ সুন্দর ডৌলটি শুনে মনে হল যোগিয়াকে বুঝি নানা রঙে সাজালে—মোতিম বনা দে!

খাঁ-সাহেবের কণ্ঠে আজকাল আর সুর তেমন করে খেলে না। আনন্দের ওপর তাই তাঁর পরম নির্ভর। সন্ধ্যাবেলা যখন টুং-টাং ঘণ্টা বাজিয়ে ল্যাণ্ডো-গাড়ীটা এসে দাঁড়ায়, তিনি রাজবাড়ীতে চলেন বটে—তবে আজকাল পাশে থাকে আনন্দ। সন্ধ্যাবেলা খাঁ-সাহেবের গায়ে ওঠে মূল্যবান সাদা মসলিনের কাবা—পাকা চুলের নিচে একটুকরো পাকানো তুলো কানের ওপর গোঁজা থাকে—তাতে আতরের গন্ধ ভুরভুর করে। আনন্দের চেহারায় বিলাসিতার কোন ছাপই নেই। ধুতিটি সুন্দর ভঙ্গীতে পরা, সাধারণ সাদা পাঞ্জাবি গায়ে। অবাধ্য চুলগুলোকে অনেক কষ্টে বাগ মানিয়েছে আনন্দ।

মহারাজের বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে, রঙীন কাঁচের জানলা দিয়ে সে আলো চোখে পড়ে—ল্যাণ্ডোটা যখন ঢোকে। বিশাল ঘরখানার একপাশে ফরাস। অন্যদিকে হাতীর দাঁতের কারুকাজ-করা সোফা ও গুটিকয় নিচু কেদারা। দেয়ালের একদিকে জাপানী স্ক্রীন। সূর্যের দিকে মুখ তুলে অন্ধ প্রার্থনা করছে। তার হাত ধরেছে একটি শিশু। মাথার ওপর নুয়ে পড়েছে ফুলে ভরা চেরী-গাছের ডাল। অন্যদিকে বিষ্ণুপুরের অতি সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা নক্‌শা-পাটি দেয়াল জুড়ে সাজানো। আসরের একপাশে তবলা, পাখোয়াজ, সারেঙ্গী, তম্বুরা।

আনন্দ সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে উঠে আসে—শিব এসে পাশ ঘেঁষে চলতে থাকে। আনন্দের পকেট থেকে এমন অনেক জিনিস শিবের পকেটে চালান হয়ে যায়, যা শিবের পক্ষে নিষিদ্ধ পথ্য। চানাচুর, বড়বাজারের ঝাল আচার, মটর কাবলী— ।

শিব আর ইন্দুর মাস্টারির চাকরি থেকে ছুটি মিলেছে দয়ালদাসের। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কের বাতিক-ও চলে গিয়েছে। তবে তাঁকে নতুন কাজও দিয়েছেন মহারাজ। কলকাতায় জ্ঞানী-গুণীরা এলে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে আনা—এ-ও দয়ালদাসের কাজ। সে আসরে আনন্দকে কেন গাইতে দেননা খাঁ-সাহেব, তাই নিয়ে মনে একটা ক্ষোভ আছে দয়ালদাসের। খাঁ-সাহেব বলেন—তুই গাওয়াইয়াকে লড়িয়ে দিয়ে মজা করা, ও তো হোরিতে শোর মচাবার সামিল, দয়াল।

কিন্তু অভিযোগটা যখন বাইরে থেকেও আসতে শুরু করল তখন একদিন বসল আসর।

ভরা চৈত্রমাস। এবার হোলি ছিল ফাল্গুনের শেষের দিকে। তাতেও ফুরোয়নি আবীর। হোলির রং অজস্র ধারে ছড়িয়ে গিয়েছে পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ও গুল্‌মোরের ডালে। ১৯২৩ সালের কলকাতা। দক্ষিণের এই অভিজাত অঞ্চলের পথের দুই পাশের বড় বড় গাছগুলিতে পত্রপুষ্পের সম্ভার। দুপুরের আতপ-তাপ কমতে-না-কমতে রাস্তা ভিজিয়ে জল দিয়ে যায় মালী। গরম পিচে জল প'ড়ে ধোঁয়া ওঠে। সূর্য হেলতে-না-হেলতে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ছুটে আসে ঠাণ্ডা বাতাসের তরঙ্গ। সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি বাগানের এই পাগলামি চলে। বেলফুলের গোড়ে মালা আর ঠাণ্ডা বরফের পসারী ডেকে ডেকে ফেরে। কলকাতায় বসন্তের বুঝি তুলনা নেই। এ সময়কার প্রভাত সুন্দর। দুপুর অজস্র মায়াময় স্বপ্নের জাল বোনে। বকুল-গন্ধ-মদির পরিবেশে তরুণ-তরুণীর হৃদয় উদ্বেল হয়।

এমনি সময় এক শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় রাজবাড়ীতে আসর বসল। পশ্চিমের গাড়ী-বারান্দায় ফিটন, মোটর, ল্যাণ্ডো এসে দাঁড়াল। অতিথিরা আগে গেলেন পাশের জাপানী ঘরে। গান শোনবার মেজাজী আমেজ তৈরি হবে সেখানে।

পেছনের ছোট ঘর দিয়ে নিঝুম বারান্দা পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি ধরে দক্ষিণের ছোট ছাতে উঠে যায় আনন্দ। হাসিমুখে এগিয়ে আসে ইন্দু। আনন্দ কথা বলে না। চোখ-ভরা দুষ্টুমি নিয়ে নিরীক্ষণ করে ইন্দুকে। বাসন্তী রঙের নতুন তাঁতের কাপড় পরেছে ইন্দু ঘরোয়া ঢঙে। মুগার জামা পরেছে। খুব বড় একটা খোঁপা বেঁধে তাতে জড়িয়েছে বেলফুলের মালা। সন্ধ্যাবেলা স্নান করেছে, তার একটা মৃদু সৌরভ ইন্দুকে ঘিরে আছে। পায়ে ঢাকা চটি। ইন্দু বললো—কি দেখছ বল তো?

—'বলছি দাঁড়া।' দাঁড়াতে ব'লে কিন্তু বসে পড়ে আনন্দ নিচু আলসেটার ওপর।

এপাশের বাগানটা আজকাল একেবারেই পরিত্যক্ত। মস্ত একটা বকুলগাছ ছাতের গা ঘেঁষে উঠেছে। শুক্লপক্ষের একফালি চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্নায় আকাশ স্বচ্ছ দেখায়। দুজন দুজনকে ছাখে আর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এতদিনের পরিচয়, তবু কেন যেন নতুন নতুন লাগে ইন্দুকে। আনন্দের চোখের মধ্যে সেই বিস্ময়টা ছাখে ইন্দু। একটু হাসে। হাসিতে এমনিতেই একটু লজ্জার ফাগ মাখানো। সে ফাগের রং আস্তে আস্তে ইন্দুর মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের উত্তাল ঢেউ দুজনকে ঘিরে বকুলফুলের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। আনন্দের চোখের কৌতুক কখন যে গভীর বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয়েছে তা সে নিজেই জানে না। নীরব মুহূর্তগুলি এত কথা কইতে চায়, যে বিভ্রান্ত হয়ে যায় আনন্দ। তার পর হাসে। বলে—সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।—অরুণ-কিরণ মলিন ইন্দু কুমুদ মুদিত লাজে!

আনন্দের মুখে কবিতা শুনে হেসে ফেলে ইন্দু। আনন্দও হাসে। বলে—ভাবছিস কি, আজকাল খুব কবিতা পড়ছি।

—বেশ তো! হাসে ইন্দু। বলে—কেন ডেকেছি বল তো?

—এই প্রশংসা শোনবার জন্যে।

—ইস্! একটা কথা বলব বলে।

—কি কথা?

—আমি কাল পুরী চলে যাচ্ছি, জান?

—সে কি?

—তুমিও যাচ্ছ।

—কে বললে?

—বাবা বলেছেন। আমরা যাব আগে। তোমরা আসবে পরে। শিবের পরীক্ষা হলে পরে। আমি, মা, বাবা সবাই আগে যাব। ঠিক এসো কিন্তু আনন্দদা—ভুলে যেয়ো না।

ঘড়িতে আটটা বাজল। আনন্দ চমকে উঠল। বললো—আমি চলি। তুই শুনবি তো? কোথায় বসবি?

—বাবার স্টাডিতে। নিশ্চয় শুনবো।

তারপর কাছে এসে নিঃসঙ্কোচে মমতায় আনন্দের হাতে হাত রাখল ইন্দু। বললো—খুব ভালো করে গাইবে আনন্দদা, ভয় কি!

—তুই বলছিস্! আনন্দ ইন্দুর মুখখানা ভালো করে ছাখে। চোখে চোখে হাসে। বলে—নিশ্চয় গাইব।

নেমে যায় আনন্দ। পেছনে পেছনে চলে ইন্দুও। ততক্ষণে আসর বসেছে। দয়ালদাস নির্মমভাবে সারেঙ্গীর কান মোচড়াচ্ছেন। জোড়াসন হয়ে বসে আনন্দ। গুরুজীর দিকে ঝুঁকে পড়ে নির্দেশ শোনে। বেনারসের ছেলে, স্বীয় স্থানের মর্যাদা রেখে বসন্ত শুক্ল-রজনীতে হোরি-ঠুংরী গাইতে চায়। ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে সম্মতি দেন জমীর খাঁ। প্রফুল্ল হয়ে আনন্দ সহাস নয়নে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে এরকম ভাষা-বিনিময় অনেক চলে। সস্নেহ প্রশ্রয়ের যে ভাবটা মুখে চোখে ফুটে ওঠে খাঁ-সাহেবের, তা দেখতে বড় সুন্দর লাগে। তরুণ গায়কের কণ্ঠে—'না মারো না মারো সৈঁয়া গুলাল পিচ্‌কারি, মোবি রাজা—!'—প্রকাশ হয় এক নিরাভরণ কাঠামোর ছলনায়। ফাগুয়াব গান, তবু এতে রংরাগ এখনো ধরা পড়ে না শ্রোতাদের নিবিষ্ট শ্রবণে। এ শুধু কাতরা নায়িকার মিনতি—গুলাল পিচ্‌কারি মেরো না হে প্রিয়, হে রাজা! ধ্রুপদের ধীর গম্ভীর গতিতে গানের স্থিরমাধুরী ফোটে। তারপর শুরু হয় বিস্তার। বিশাল প্রাণবন্যাকে সংযত করে ঝর্ণা যেমন লীলা-চঞ্চল ভঙ্গীতে তটিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে এগিয়ে চলে—আনন্দের তরুণ কণ্ঠেও সেই অনায়াসশক্তি পরিস্ফুট হয়। শক্তিশালী গম্ভীর সুন্দর কণ্ঠ। পদ আশ্রয় করে পর্দায় পর্দায় তার স্বচ্ছন্দ ওঠানামায় নির্ঝরের লীলা ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে গানের মধ্যে গায়কের মনের রং লাগে। বাইবের থেকে মনটা গুটিয়ে এনে আনন্দ ডুবুরীর মতো চিত্তের অতলে মুক্তার সন্ধান করে। অন্তরে তার ফাগ লেগেছে। সে ফাগের রঙে তার অপাপবিদ্ধ শুভ্র হৃদয় রঙিয়ে গিয়েছে। মন ভরে গিয়েছে বলেই এ ফাগের সন্ধান আনন্দ শ্রোতাদেরও দিতে চায়। তরুণ বয়সে মনে অজান্তে যে রং লাগে, বড় গোপনচারী সে রং, অথচ অনভিজ্ঞ হৃদয় কখন যেন লালে লাল হয়ে ওঠে। আনন্দ প্রকৃতিগত ভাবে আত্মসচেতন নয়। আজ সন্ধ্যায় ইন্দুর চোখে সে নিজেকেই দেখেছে। তার নিজের মধ্যে রূপরাগ, আনন্দ-বেদনার সমুদ্র দোলায়মান, এ জেনে তার বড় ভালো লেগেছে। একে হোরি-ঠুংরীর কাজই হচ্ছে কৃষ্ণলীলার রসমাধুরী শ্রোতার মনে সঞ্চার করা,—তাতে আনন্দের মনের উৎসবও এই আস্থায়ীর ডৌলটিকে নতুন নতুন মণিমঞ্জুষায় সাজাচ্ছে—বিস্ময় ও আনন্দে শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সুরের ফাগে মাতাল আনন্দ

ফিরে আসে মুহরায়—না মারো গুলাল মোরি রাজা! ব্রজধামের বসন্ত-উৎসব, কৃষ্ণ ও রাধাকে ঘিরে যৌবনের অভিষেক, এ যেন শ্রোতাদের মনের পটে ছবির মতো খেলতে থাকে। গানের পুকার শুনে শিউরে ওঠেন শ্রোতারা। কোঁকড়া চুলগুলি স্বেদসিক্ত ললাটে এসে পড়ে—মুখে ফোটে অন্তরের প্রসন্নতা। গান শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। শ্রোতাদের ঘন ঘন প্রশংসা শুনে সাশ্রুনয়নে জমীর খাঁ সাহেব সেলাম জানাতে থাকেন—যেন তিনিই গেয়েছেন গানটা। আর আড়ালে বসে শুনতে শুনতে আনন্দে প্রেমে মমতায় ইন্দু যেন মরে মরে যায়।

দিন চলে যায়। দিনগুলিকে সোনার খাঁচায় ধরে রাখা যায় না। রাখতে পারলে, অনেক পলাতক দিনের পায়েই শেকল পরাত আনন্দ আর ইন্দু। বাল্য থেকে যাকে এত সহজভাবে কাছে পেয়েছে, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাকে আরো ভালো লাগবে সে তো জানা কথা। জানা কথাটাই এমন নতুন হয়ে উঠেছে কেন সে প্রশ্ন তাদের মনে জাগে না। বড়-উদাসীন আনন্দ, আর ইন্দু বড় সহজ, সরল। দুনিয়ার সম্বন্ধে দুজনেই অনভিজ্ঞ। দেখা হলে ভালো লাগে। কিন্তু ক্ষণ-অদর্শনেই হৃদয়-দহন-জ্বালা, সে তো কখনো হয় না। হয় না বলেই হয়তো আনন্দ বা ইন্দু বোঝে না তাদের পারস্পরিক হৃদয়ানুভূতির নাম প্রেম। আনন্দ অশান্ত, অস্থির, উদ্দাম। ইন্দু স্বল্পভাষিণী, শান্ত, গম্ভীর।

কত সুন্দর দিনই যে এল আর গেল! পুরীতে সমুদ্রের ধারে তারা দুজন বালিতে নাম লিখে এসেছিল—সে লেখা পলকে ধুয়ে নিল সমুদ্র। সমুদ্রের উদ্দাম ঢেউয়ে দুজনে কাগজের নৌকো ভাসিয়েছিল। কোথায় ভেসে হারিয়ে গেল নৌকো।

এক রাতে নিশি ডেকেছিল আনন্দকে। সে অনেক রাত। চাঁদ উঠেছে মাঝ আকাশে। আনন্দের কানের ভেতর দিয়ে মর্মে ঢুকেছে সমুদ্রের গান। ঘুমের মাঝেও মনে হচ্ছে যেন তাকে সস্নেহে হাজার ঢেউয়ে দোলাচ্ছে। এমনি সময় মনে হল তাকে যেতে হবে। উঠে এল আনন্দ। মনে হল হাজার হাজার কণ্ঠে কাদের গান শুনতে পাচ্ছে সে। ঘর ছেড়ে বালিতে নামতেই চমক ভাঙল তার। ঘুমের চমক ভাঙল, কিন্তু জাগল আনন্দ আর-এক স্বপ্নের মধ্যে।

রাত হবে দুটো। শ্রীনটপুরের সুন্দর একতলা বাড়ীটা বালির আড়ালে একটু ডুবে ঘুমোচ্ছে। চাঁদ শহরেও ওঠে, কিন্তু মাঝরাত্রির চাঁদকে দেখতে হলে এইরকম পটভূমিতে দেখতে হয়। ক্ষীণ রেখায় চাঁদ উঠেছে আধো আকাশে। আকাশ জুড়ে তারাগুলি কোন বিশ্বশিল্পীর হাতের আলপনার ছবি হয়ে ছড়িয়ে আছে। সাদা বালির বেলাভূমির এখানে সেখানে বাড়ীগুলি ঘুমিয়ে আছে। সমুদ্র কাঙাল হয়ে লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলে চাঁদকে যেন ডাকছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফস্‌ফরাসের আলো। সমুদ্রের সঙ্গীত ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। বিমুগ্ধ আনন্দ এগিয়ে চলে। শীকর-কণা বয়ে আনে ঠাণ্ডা বাতাস। বৃষ্টির মতো তার মুখে চোখে লাগে। সমুদ্রের সঙ্গে চাঁদের মিতালির কথা শুনেছিল আনন্দ, কিন্তু এত প্রেম? এত জল সাগরের বুকে, তবু তার এত তৃষ্ণা? তৃষ্ণার্ত প্রেমিকের মতো সাগর ডাকছে চাঁদকে। চাঁদের জ্যোতি একটু একটু করে উজ্জ্বল হচ্ছে, তবু একাদশীর চাঁদের হাসিটুকু করুণ। যেন চাঁদ বলছে—এখনো সময় হয়নি। পূর্ণিমা-তিথিতে আমি ডাকব তোমাকে, আর ফুলে ফুলে উঠবে তুমি, এখনো সে সময় নয়। এখন আমি চলে যাব। আজ তো সে লগ্ন নয়!

সমুদ্রের আকুলতা দেখতে দেখতে আনন্দের মনে অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। যেন এই মরদেহের বাইরে, অনেক অনেক দিন ধরে এইসব

সে চিনত, জানত। একদিন ছিল, যখন সমুদ্র, ঢেউ, বাতাস আর বালিকণাগুলির সঙ্গে সে মিলিয়ে ছিল। কেমন করে ভুলে ছিল সে? সমুদ্রের গম্ভীর মন্দ্রে সে যে কত গান শুনতে পাচ্ছে! কে সৃষ্টি করেছিল এই বিপুল অনাদি সঙ্গীত? নীল জলকে ভয়াল ও সুন্দর মনে হয় আনন্দের। মনে হয় ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিলীন হয়ে যায়।

মেঘ এসে ঢাকে চাঁদ। সমুদ্রকে একনিমিষে দেখায় প্রলয়ঙ্কর। মানবিক সত্তাটা তুচ্ছ হ'তে হ'তে মিলিয়ে যায়। অজান্তে এগিয়ে যেতে চায় আনন্দ। এমন সময় পেছন থেকে কাদের আকুল কণ্ঠ ডাকে—আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ!

দুই হাতে কান চেপে ধরে আনন্দ। সামনের আর পেছনের ডাক দুটোই বন্ধ করে দিতে চায়।

লণ্ঠন হাতে ছুটে আসে লোকজন। তীব্র আলো পড়ে আনন্দের মুখে। শূন্য শয্যা আর খোলা দরজা দেখে ছুটে এসেছে তারা।

সকালে কিন্তু ইন্দু ক্ষমা করেনি তাকে। চা-এর টেবিলে বলেছে —কেন তুমি একলা চলে গিয়েছিলে? কি জন্যে? মরতে সাধ হয়েছিল, তাই না? কেন গিয়েছিলে?

আনন্দ বলেছে—পাগলামি। ঘাড়ে ভূত চেপেছিল। চা দে।

শিব বলেছে—আমি বুঝেছি। বাবার মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনে আনন্দদা'র মহাসমাধি পাবার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই না?

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছে আনন্দ।

যোগীশ্বর তাকে বুঝিয়েছেন। বলেছেন—শেষ অবধি শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। মনে করলেন এই সমুদ্রই তাঁর কৃষ্ণ।

পরে জগন্নাথের মন্দিরের সামনে দেশী রুপার গহনা দেখতে-দেখতে আর তীর্থযাত্রীদের ভীড়ে গা ভাসিয়ে চলতে-চলতে আনন্দ যোগীশ্বরের কথার মানে বুঝল। সেই সঙ্গে নিজেকেও বুঝল।

দেবতা গৌরাঙ্গকে সে বোঝে না। কিন্তু যে মানুষটার হৃদয় সমুদ্র দেখে পাগল হয়ে ওঠে তাকে সে শ্রদ্ধা করল। সমুদ্রের টান বড় প্রবল। আত্মহারা হয়েই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

এতদিন আনন্দের মন ছিল শান্ত সমাহিত, অবচেতনের অতলে সুষুপ্ত। কিন্তু যৌবনের প্রথম পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ঘুম ভাঙল। যে মানুষটির আলো ধরে তার মন নিজের সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠল, সে ইন্দু। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রয়োজনও অনুভব করল সে—কেমন যেন মনে হল ইন্দুর সঙ্গে তার খানিকটা বোঝাপড়াব দরকার হয়েছে। সে প্রয়োজন-বোধ একান্তই ব্যক্তিগত, তাব নিজস্ব। ইন্দুর দিক থেকে কিছু যে বলবার থাকতে পারে সে কথা আনন্দ আজও বোঝে না। ইন্দুব স্নিগ্ধ সংযত ও শান্ত ব্যক্তিত্ব চিরকালই আনন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করে এসেছে।

তবু আজ আনন্দ প্রয়োজন অনুভব করছে বোঝাপড়া করবার। অন্ততঃ ইন্দু যে তাব কাছে ধীরে ধীরে বিশিষ্ট হয়ে উঠছে এ-কথাটা তার না বলে উপায় নেই। তাগিদটা একান্তই তার। বরফের নিচে নদী ঘুমিয়ে থাকে যখন, তখন তার মধ্যে কোন গতি নেই। যেই রোদের তাপে বরফ গলে জলের ধারা নামে—নদী জেগে ওঠে, সেই সে ধেয়ে চলতে চায়। পরিণতি চায়।

আনন্দের সহসা জাগ্রত মনেও আজ তেমনি একটা তাগিদ। এতদিনের অভ্যস্ত দুনিয়া তার টালমাটাল হয়ে গিয়েছে। ইন্দুব হাসি চাহনি কথা, সবগুলো বড় মূল্যবান হয়ে উঠেছে তার চোখে।

খাঁ-সাহেবের নির্দেশে মোমবাতি জ্বেলে সাধনা করে আনন্দ অনেক রাত্রে। সেই সব একান্ত মুহূর্তে মনে হয়—আলাপ, বিস্তার ও তানের অলঙ্কারে সে যাকে সাজাচ্ছে সে যেন কুকুভা-রাগিণীর আস্থায়ী নয়, সে ইন্দু। তার মর্মবাণী হচ্ছে গান। গানের সুরে সুরে

যেন ইন্দুকেই সে সুন্দর করে তুলছে। তার গান যত খুলে যাচ্ছে ততই সুন্দর হচ্ছে ইন্দু।

ভাবতে বা চিন্তা করতে যারা অনভ্যস্ত, কোন সমস্যা এলে তারা বড় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যে কোন রকমে কথাবার্তা ক'য়ে মিটিয়ে নিতে চায় ব্যাপারটা। আনন্দের মনের অবস্থাও সেই রকম। নিজের মন নিয়ে এত বিব্রত হ'তে নারাজ সে। কাজেই তার মনে হয়, কোনমতে ইন্দুর কাছে যদি বলে ফেলতে পারে তাহলেই অনেকটা হালকা লাগবে তার। সুযোগ খুঁজতে লাগল আনন্দ।

সহসা সুযোগ মিলে গেল। ইন্দুকে নিয়ে মহারাজা এলেন বরানগরে এক হেমন্তের সন্ধ্যায়—ওস্তাদ ও আনন্দের বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে।

বারোবছরের বাগানবাড়ীটার চেহারা সামান্য পুরোনো হয়েছে মাত্র। সেদিনকার চারাগাছগুলো আজ পরিণত হয়েছে সতেজ সুন্দর কিশোর তরুতে।

বাড়ীতে ঢুকে গাড়ী থামিয়ে মহারাজ উঠে গেলেন ওস্তাদজীর কাছে। ইন্দু গেল বাগানের দিকে।

সন্ধ্যা হয়েছে। পুকুরের পাশে অর্কিড-ঘরে বসে বসে অধীর হয়ে উঠেছে ইন্দু। এখনও এল না আনন্দ। ভয় করছে তার। বার বার দেখছে জাফরির ফাঁক দিয়ে। বাবা কথা বলছেন ওস্তাদজীর সঙ্গে এই যা সান্ত্বনা। কিন্তু আনন্দ কেন দেরি করছে?

—কি ভাবছ?

চম্‌কে উঠল ইন্দু। দরজায় হেলান দিয়ে নিঃশব্দ কৌতুকে হাসছে আনন্দ। কৈশোরের সেই সরল লাবণ্য তেমনই আছে। ছিপছিপে একহারা চেহারা। ভিতরের দুরন্ত বালকটির কিছু পরিচয় এখনও উঁকি দিচ্ছে অবাধ্য চুল আর চঞ্চল চোখের মধ্যে। হেসেই জবাব দিল ইন্দু—ভাবছি কত দেরি করছেন আপনি।

—আপনি কি ইন্দু ?

—তুমিই বা কবে তুমি বলেছ আমায় ?

—তা একটু ভয়-ভয় করছে বইকি—এবার দার্জিলিং বেড়িয়ে এলে, রানীমার অসুখে থেকে এলে আটমাস। তারপর থেকেই শুনছি তুমি বড় হয়ে গিয়েছ। তোমাকে আর তুই বলা চলবে না—ওস্তাদ বলছেন, শিব বলছে, মাস্টারবাবু বলছেন······আমি তো ভাবছি গাড়ী চড়ে কেঁদেকেটে চলে গেল, সে হচ্ছে ইন্দু।

—আর ফিরে এলে কি দেখছ ?

—রাজকুমারী ইন্দুমতী দেবী।

—আবার ?— ভ্রূকুটি করল ইন্দু। বললো—বলেছি না, নামের আগের কথাগুলো তুমি কথায় কথায় টেনে এনো না।

—বেশ তো। কিন্তু যাই বল, তুমি বেশ একটু বদলে গিয়েছ।

উত্তব দিল না ইন্দু। স্মিতমুখে চেয়ে রইল। প্রায়ান্ধকার ঘর। রেশমের পার্সী শাড়ী, মুক্তোর শেলী পরনে, চুলে বেণী বাঁধা, পায়ে নাগরা—বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ইন্দুকে। আনন্দ বললো—আমি এতটুকু বদলাইনি—শিব ঠিক কথাই বলে।

—কি বলে ?

—বলে, দেখ আনন্দদা, দিদি মেয়ে বলে ওর বেলা সবই অন্যবকম, ওর সব-কিছুই মাফ—বিশেষ করে বাবার কাছে। আমাব বেলা ভোরবেলা পঞ্চকন্যা-স্মরেন্নিত্যং করে ঘুম ভেঙে ওঠার থেকে রাত ন'টা অবধি শুধু লেখাপড়া, কুস্তি শেখা, সাঁতার কাটা, সংস্কৃত পড়া, বিকেলে বেড়ানো—পুরো দিনটা যেন নিয়মের ছকে বাঁধা। বড় হলে আমি ভীষণ প্রতিশোধ নেব।

দুজনেই হাসল। ইন্দু বললো—গতবছর ফেল করেছে সেই থেকে তো ছুটি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন মাস্টারবাবু—তাই তুমি ছাড়া ওর গতি নেই। বাবা তো তাই বলেছিলেন—

—কি বলছিলেন ?

—আনন্দ রয়েছে বলে বড্ড সুবিধে হয়েছে শিবের—এবার আনন্দকে সেইজন্যই ওস্তাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি···যাবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—কতদিনের জন্যে ?

—শুনেছি তো তিনমাস।

—এ কি রকম হল বলো—আমিও এলাম, আর তুমিও চললে।

—তাতে কি হয়েছে···দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

—যাবার আগে একদিন গানবাজনা হবে না ?

জবাব দিল না আনন্দ। ইন্দুর দিকে চেয়ে ঈষৎ কপাল কুঁচকে কি যেন ভাবল···তার পর পরিহাস-বর্জিত কণ্ঠে বললো—ইন্দু···

—কি ? বলতে গিয়ে চুপ করে গেল ইন্দু। আনন্দের চোখে কি রকম অন্যরকম যেন চাহনি। একটু অপরিচিত লোকের মতন। তার বারোবছরের চেনা মানুষটা যেন নয়। ইন্দুর মনে হল, বারোবছর ধ'রে জানে আনন্দকে, কিন্তু কতটুকু জানে ? অনেকখানিই তার অজানা। তা ছাড়া এখন এই মুহূর্তে, এত কাছে আছে আনন্দ, তবু মনে হচ্ছে সে যেন অনেক দূরের। কেন যে এরকম সব কথা মাঝে মাঝে মনে হয় তার। তার স্বগত চিন্তার খেই ধ'রে আনন্দ আবার বললো—ইন্দু, শোন্ গত বছর আমরা পুরী গিয়েছিলাম।··· মনে পড়ে ? আমি আর শিব পরে গেলাম ?

—হ্যাঁ।

—একদিন সমুদ্রের ধারে কি বলেছিলাম মনে পড়ে তোর ?

—হ্যাঁ।

—বলেছিলাম—সমুদ্র দেখে দেখে মনে হয় আমি কোথা থেকে এসেছি জানি না—কোথা যাব তা-ও জানি না, শুধু তোদের সঙ্গে

জড়িয়ে পড়ে কি রকম যে হয়ে গেল, যদি চলে যেতে হয়, বড় লাগবে।

—সে কথা আজ কেন বলছ আনন্দদা ?

—বলছি কেন জানিস্ ? গান করতে আমার খুব ভালো লাগে। তখন আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই, এমন কি পরে যদি বলিস্ যে কি গেয়েছিলাম, আবার যে ফিরে গাইতে পারব, তা-ও মনে হয় না। সে আমি ভুলে যাই, আবার ফিরে ফিরে পাই। কিন্তু আমাকে তুই ভুল বুঝিস্ না, তোর কথা আজকাল আমার বড্ড মনে হয়। কি রকম হয় জানিস্ ? ভয় হয় দুঃখ হয়, আবার একটা অদ্ভুত আনন্দও হয়।

—ভয় কেন আনন্দদা—

—সে কথাই বলি, ইন্দু। বল্ তোর কথা ভাববার আমার কি অধিকার আছে ? ছোট্টবেলা থেকে একদিন এ কথা তুই বলতে দিলি না, তোর আর আমার মধ্যে যে কোন তফাত আছে তা বুঝতে দিলি না—তোর মন বুঝি, প্রাণ বুঝি, কিন্তু সত্যি-সত্যিই তো তোর সঙ্গে আমার কোন তুলনাই হয় না। তুই তো রাজার মেয়ে, আর আমি কোথাকার কে তাই জানি না···আমার ওস্তাদ বলেন আমি গায়ক, ব্যাস, ফুরিয়ে গেল—আমার অন্য পরিচয়ের দরকার নেই···

—সে তো ঠিক কথা, আনন্দদা—

—না ইন্দু, সে ঠিক কথা একটা আলাদা জগতে, সেখানে জাতের কথা কোনদিনই উঠবে না—তার সঙ্গে তোর কোন যোগ নেই। তুই যে-জগতের মানুষ, সেখানে জাতকুলের কথা চিরদিনই থেকে যাবে। সেখানে আমার ঠাঁই কতখানি তা আমি জানি।

—বাবা মা তো তোমাকে সে চোখে দেখেন না, আনন্দদা।

জিব কাটল আনন্দ। বললো—ছি ছি, ·ইন্দু, তাঁদের কথা তো বলিনি আমি। তাঁদের কথা তো ওঠেই না। মহারাজ তো মহারাজ,

কি খেতাবে, কি কলিজায়। আমি বলছিলাম, তোর সঙ্গে আমার সহজ মেলামেশা আর বোধহয় সম্ভব নয়। আমার নিজের মন পরিষ্কার নেই। যা বলবার বললাম তোকে, ভেবে দেখিস্।

বড় মমতা হল ইন্দুর। বললো—আনন্দদা, কি যে বল তুমি··· কি বল, তা নিজেই জান না।

—কি জানি না?

—বারোটা বছরকে কি অমনি ভুলে যাওয়া যায়? উড়িয়ে দেওয়া যায়? মুছে দেওয়া যায় জীবন থেকে? তুমিই বলো আনন্দদা, সে কি আমিই পারি, না তুমিই পার? তার চেয়ে আমরা যে যেমন আছি, তেমনই থাকি···তুমিও আমাকে জান, আমিও তোমাকে জানি—এর চেয়ে বেশী জানতে চেয়ে কি হবে বল, আনন্দদা? আর···

—আর কি ইন্দু?

—তুমি তো জান আমি মিথ্যেকথা কইতে পারি না। আমি তো তোমায় ভুলতে পারব না, আনন্দদা। বল, কি ভুলতে বলবে? সেই হোরি-ঠুংরীর সন্ধ্যা···

—তুই যেদিন হলদে কাপড় পরেছিলি?

—তা হবে। তা ছাড়া বলো আরো কত সকাল কত সন্ধ্যা··· পুরীর একটা দিনের কথাই বললে আনন্দদা—সেদিনের কথা তো বললে না, যেদিন রাতে উঠে চলে গিয়েছিলে?

—জানি ইন্দু।

—জান যদি, তো বোলো না। বোলো না যে, সব ভুলে যাও। ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়?

এত কথা কখনো বলেনি ইন্দু। চোখ তার জলে টলটল করে। মুছে দিতে গিয়ে চিবুক ধরে চায় আনন্দ তার মুখের দিকে। নিষ্পাপ প্রেম-ভরা চোখ। সযত্নে মুছে দেয় আলগা করে। ইন্দু রুমালে মুখ মোছে। আনন্দ বলে—আর বলব না রে।

সাশ্রুচোখেই সামান্য হাসে ইন্দু।

দুজনেই চুপ করল। আরো যে কথা কইতে হল না তাতে বড় কৃতজ্ঞ বোধ করল আনন্দ। সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে এসেছে ততক্ষণে। ঝাঁক বেঁধে টিয়াপাখী বাসায় ফিরছে। গাড়ী জুড়বাব আগে বুড়ো রহমৎ নামাজ পড়ে নিচ্ছে পশ্চিমমুখো হয়ে। তার আজান শোনা যাচ্ছে।

ইন্দু বললো—চলো আনন্দদা। সন্ধ্যা হয়ে এল।

—চল্ ইন্দু···

—দেখ, এমন সব কথা বললে, যে আসল কথাটা বলতে ভুলে গেলাম।

—কি কথা ইন্দু ?

—যাবাব আগে সেই গানটা রেকর্ড কবতে হবে—বাবা বলেছেন। বাবাব লেখা গান আব তোমাব দেওয়া সুব—খুব ভালো লেগেছে বাবার, জানো ?

—কথাব জন্যে সুবটা ভালো হয়েছে—

—সুবটার জন্যেই কথাটা···বেশ, গাও ! প্রমাণ হয়ে যাক্।

একটু হাসে আনন্দ। তারপব গুনগুন ক'বে গায়—

'মনে বেখো সখা এ সুখেব দিন
ভুলিযা যাবে কি সবই ?
যদি নাহি থাকি সাথে বাসর জাগাতে
তবু ভাতিবে প্রদীপ সে সুখ-নিশীথে
প্রভাতে হাসিবে ববি—'

দুজনেই চুপ করে থাকে।

তারপর অজান্তেই একটা।দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে ইন্দুর। বলে—চলো আনন্দদা।

—চল্।

কথা বলতে বলতে তারা বাড়ীতে এসে ঢুকল। ততক্ষণে গাড়ী এসে পৌঁছেছে গাড়ী-বারান্দায়। অসহিষ্ণু ঘোড়া-দুটোকে চাপড় মারছে রহমৎ। স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ওস্তাদ। বারোটা বছর জমীর খাঁ সাহেব খেয়ালিয়ার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সেদিন বয়স ছিল সত্তর, আজ বয়স হয়েছে বিরাশী। বার্ধক্য এই পুণ্যনামা ব্যক্তির দেহকে কিছু নমিত করেছে, কিন্তু জরাজীর্ণ করেনি। এ যেন বৈরাগী শীতের শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশের এক ঐশ্বর্যময় মূর্তি। যেন খেলাচ্ছলে এক শুভ্র রাজবেশ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন কোন মহাসাধক। আহ্বান এলেই জীর্ণবাসের মতো আবরণখানা অবহেলে ত্যাগ করে চলে যেতে পারবেন—এতটুকু দেরি হবে না।

বিনয়াবনত হয়ে মহারাজা যোগীশ্বর বিদায়-ভাষণ জানালেন। বললেন—এই যে আনন্দ, কোথায় চলে গিয়েছিলে? ইন্দু, বড় দেরি করেছ মা···

ওস্তাদ বললেন—যোগীশ্বর! সব কাজই বাকি তোমার জীবনে, ডাক্তার দেখিয়ে শরীরটা ঠিকঠাক করে নাও···তোমাকে ঘিরে এতগুলো লোক বাঁচছে, সেটাও তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না —তুমি মহারাজ:··

—আপনার কাছে নই, ওস্তাদ···

—হ্যাঁ, আমারও তুমি মহারাজ।

দুজনেই স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর ওস্তাদ বললেন —আমি যাবার পথে কাশী, গয়া, এলাহাবাদ সব জায়গাতেই নামব একবার ক'রে। কাশীতে গণেশনারায়ণের বাড়ীতে অতিথি হয়ে আছেন সয়াদিন খাঁ। বরোদা থেকে ছোট জোহ্‌রা এসেছেন গয়াতে —মহাবীরপ্রসাদের বাড়ীতে তাঁকে ধ'রে কিছু ঠুংরি শুনিয়ে দিতে পারি···তা ছাড়া আগ্রা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর···তিনমাসে যতটা হয়। তুমি চিঠি পাবে ঠিক-ঠিক।

যোগীশ্বর বললেন—আনন্দ, তোমার ওপর ভার থাকল ওস্তাদের ···আমার কাছে ফেরত এনে দেবে। স্টেট থাকলে আমার মতো রাজা অনেক মিলবে, কিন্তু হিন্দুস্থানে কারও ঘরে আর একটা জমীর খাঁ নেই।

*

সিদ্ধিমালাইয়ের একটু শরবত নিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে আনন্দ বসল বাইরের বারান্দায়। সামনে শিরীষগাছটার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদ উঠেছে। কুয়াশার আড়ালে চোখে পড়ে মুঠো মুঠো তারাও উঠেছে আশেপাশে। ইন্দুকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছিল একটু। সবচেয়ে ভালো দেখায় যখন বৈশাখের ভোরে শিব গড়িয়ে পুজো করে, লালপাড় গরদ পবে, এলোচুলে, খালিপায়ে নূপুর পরে গাড়ী থেকে নামে ইন্দু। কোনদিন দেখা হয়ে যায় তো একটু হেসে চলে যায়।

*

বাড়ী পৌঁছে ওপরের ঘরে চলে গেল ইন্দু। গহনা খুলে রেখে কাপড় না ছেড়েই পা মেলে বসল খাটে। অধিকার···অনধিকার ···কত কথাই আজ বলছিল আনন্দদা। কি যে বলে, তা নিজেই বোঝে না। এসব কথার জবাব দিতেও তো জানে না ইন্দু···শুধু মনে কেমন একটা বেদনা বোধ হয়। বড় মসৃণ জীবন তার, প্রমাণ-সাইজের কাঁচের আয়না চারিপাশে বসানো একখানা ফাঁকা ঘরের মতো। নিজেকে হাজার বার হাজার রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা ছাড়া কোন কাজ নেই। আজ প্রথম মনে হল তার, অন্যরকম জীবনও তো আছে, সেখানেও তো মানুষ বাঁচে···আজ তাকে কি বলতে চেয়েছিল আনন্দদা? যদি সে অন্য মানুষ হ'ত, তাহলেই কি তার সঙ্গে মেলামেশার মাঝখানে অধিকার-অনধিকারের কথা উঠত না?

*

নৈশস্নানের পর যখন ঘরে এলেন যোগীশ্বর, স্ত্রী এসে পাশে চৌকিতে বসলেন। বেশ প্রফুল্ল আর ঈষৎ উত্তেজিত দেখাচ্ছে যোগীশ্বরকে। সরযূকে বললেন—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ।

—বলো।

—দেখ, ইন্দু বড় হয়েছে। যখন-তখন তাকে নিয়ে তোমার বেরুনো উচিত নয়।

—কেন বলছ, বলো তো?

—এবার যখন দার্জিলিঙে ছিলাম···মনে হয় আনন্দের কথাবার্তা একটু বেশী ভাবছে ও। আমিই হয়তো দায়ী সেজন্যে। নিজের অসুখ-বিসুখ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি, ওকে খুব দেখতে পারিনি। যাই হোক, এখন তো ইন্দুর বয়সও উনিশ হল। আনন্দর সঙ্গে কথাবার্তা না কওয়াই ভালো ওর, তাই না? তা ছাড়া বিয়ে দেবে না তুমি মেয়ের?

—নিশ্চয় দেব। তুমি তো জান, ওর কুষ্ঠি দেখে উনিশ বছর না পুরতে বিয়ে দিতে মানা করেছিলেন গুরুদেব।

—উনিশ হয়েছে এবার।

—এবার দেব। দেখেশুনে, লেখাপড়া জানা সচ্চরিত্র সদ্বংশজাত একটি সুস্থ সবল ছেলে পেলেই দেব। তবে আমার মত তো তুমি জান—খেতাব খুঁজে খুঁজে বিয়ে আমি দেব না।

সরযূ বললেন—বেশ তো।

—আর কিছু বলবে?

—না।

—রাগ ক'রে বলছ না তো?

ঈষৎ হাসিমুখে মাথা নাড়লেন সরযূ। যোগীশ্বর বললেন—শিবকে কিন্তু আমি বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াব।

—বেশ।

—সব বিষয়েই সম্মতি নিয়ে রাখলাম। তুমি তো আমার গৃহিণী নও শুধু—সচিব, মিত্র, প্রিয়সখা।

—এখন আর নই।

—এখনও সরযূ, এখনও। আমার দুঃখ এই যে, সে কথাটা বুঝতে তুমি একটু দাঁড়ালেও না—আমাকে সংসারের ভার দিয়ে নিজে কী কতকগুলো সাধু-সন্ন্যাসী, যাগযজ্ঞ নিয়েই রইলে।

হেসে ফেলে উঠে পড়লেন সরযূ। বললেন—মা যে আমাব ওপর কত কি ব্রত চাপিয়ে গেলেন—তা তো দেখছ না। আর, ভালো কথা মনে পড়ল, কাল যে ব্রহ্মচারী আসবেন···শিব আব ইন্দুব কুষ্ঠিপত্র শোধন করিয়ে নেব ভাবছি।

—তোমার সেই এম.এ.-পাস ব্রহ্মচারী ?

—কতবড় পণ্ডিত বলো তো ?···ঈশ্বরকে পাঠিয়ে দিতে বলি কাউকে। কিন্তু দোহাই তোমার, মাত্রাটা মোটে ছাড়িয়ো না।

বাইরের ঢাকা-বারান্দায় বসলেন যোগীশ্বর পানপাত্রটি হাতে নিয়ে। সরযূ তাঁকে খুব বোঝে। আজই যে বে-হিসেবী হ'তে একটু ইচ্ছে করছে তাঁর, তাও বুঝেছে। ইন্দুর বয়স তাহলে উনিশ হল ? আনন্দর কথাই ভাবা যাক না। এসেছিল যখন, বয়স কত হবে ? এখন বছর পঁচিশ হয়েছে। ওস্তাদ অনেক আশা রাখেন আনন্দ সম্পর্কে। আর দুরাশাও তো নয়। বাইরে যে দু'বার গেয়েছে আনন্দ, তাতেই তো তার নাম হয়েছে যথেষ্ট। এবার ফিরে এলে পরে বড় করে জলসা দেওয়া যাবে। আশা করা যায়···কি যেন গানটা গাইতেন রসিকবাবু ? '···আশা ছিল মনে, দোঁহে একসনে কুসুম-মালাটি গাঁথিব'··· আশা তো কতই থাকে, তবু সব হয় কি ? পঁচিশ বছর···পঁচিশ বছর বয়স তাঁর নিজের কবে ছিল ? ভুলেই গেছেন তিনি। কাজ, কাজ, কাজ···কত কাজই যে করলেন তিনি

সারা জীবন ধ'রে···কাজের ফাঁকে পঁচিশ বছর বয়সটা কোথায় হারিয়ে গেল। আনন্দকে বড় ভালো দেখাচ্ছিল আজ। আনন্দ আর ইন্দু··· না না, এ কি ভাবছেন তিনি? আনন্দের বিষয়ে সচেতন হ'তে হবে···তা হওয়া যাবে···বাড়ী আর টাকা কিছু দিলে পরে···বাড়ী আর টাকা দিয়ে তাকেও জীবনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়।···এখন এত কথা ভেবেই বা কি হবে। আনন্দ তো চলেই যাচ্ছে। ভাবছেন কেন তিনি?··· ঈশ্বর?

—আজ্ঞে···

—কতটা দিয়েছিস ঈশ্বর···?

—তিনটে হল আজ্ঞে···

—আর একটা ঢাল্।

—আজ্ঞে···

গুনগুন ক'রে গাইতে লাগলেন যোগীশ্বর। বললেন—ঢেলে দিয়ে চলে যা, বুঝলি?

*

স্নেহপ্রতিম শিব—

তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, আর কোথাও থেকে না হোক, আগ্রা থেকে চিঠি একখানা লিখবই। তাই খুব জোর সংকল্প ক'রে বসলাম। কলমটা খুব চেপে ধ'রে আছি। আমার হাতে কলমের যা নাকালটা হবে, সে তো আমার অন্তর্যামীই জানেন। কোন অদ্ভুত উপায়ে এই কাঠের কলমটা যেন সে-কথা জানতে পেরে দৌড় না লাগায়। কাঠ যে সময়মতো দৌড়ুতেও পারে, সে তো আমি আর তুমি বাজিকরের খেলায় সেবার চাক্ষুষ দেখেছি।

যা হোক, কাশীতে আমরা নামিনি। এলাহাবাদ ঘুরেই চলে এসেছি আগ্রা। দিনের বেলা তাজ দেখবো না বলে চোখ তুলে আর সাহস ক'রে তাকাই না—না জানি কোন্ ফাঁকে দেখে ফেলব। কিন্তু মাথা নিচু ক'রে হাঁটতে গিয়ে বাজারে দেখি চটিজুতো, কাঠের বাক্স, পাথরের রেকাবি—সর্বত্র

শুধু তাজের ছবি। যা হোক, সন্ধ্যেবেলা আমি গিয়েছিলাম কাল। কাল পূর্ণিমা ছিল জান বোধ হয়। বেশ ভালোই লাগল। তবে দিদিকে বলতে পারো যে, দেখে আত্মহারা হবার মতো কিছু খুঁজে পাইনি আমি। এ কথা শুনে কেউ চটে গেল কি? তার চেয়ে সেকেন্দ্রা আমার ভালো লেগেছে। আর কি জান শিব, এতো অন্য লোকের কীর্তিকলাপ দেখে বেড়াতে আমার ভালো লাগে না। আমরাই কি মন্দ মানুষ?

যা হোক, আসল কথাটা বলি, এটা ওস্তাদেরও হুকুম, মহারাজকে পেশ করে দিয়ো। কাশীর সয়াদিন, গণেশজী, গয়ার মহাবীরপ্রসাদ—এই তিন গুণীজনকেই আগ্রায় পাওয়া গেছে। বরোদার জোহ্‌রা গেছেন মইহার। আমরা যদি এখান থেকে ইন্দোর যাই, তো তিনি এসে ওস্তাদের চরণবন্দনা ক'রে যাবেন জানিয়েছেন। জলসা এখনও শুরু হয়নি। কাল থেকে শুরু হবে। আমি কত আনন্দ আর আশা নিয়ে অপেক্ষা করছি, বুঝতেই পারবে।

স্নেহ ও প্রীতি জেনো। গুরুজনদের চরণবন্দনা ক'রে শেষ করলাম চিঠিটা—ইতি

তোমাদের স্নেহধন্য
আনন্দ

*

আগ্রাতে রামপুরের রাজা নরসীপ্রসাদের বাড়ীর জলসাতেই গুণী ও রসিক সমাজের কাছে স্বীকৃতি পেয়ে গেল আনন্দ। রাজত্ব নেই রাজাসাহেবের, কিন্তু রাজপাট চিরস্থায়ী নয় জেনেই হয়তো উনবিংশ শতক থেকেই গুণী গাওয়াইয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। আগ্রায় অবস্থিতি করেছেন নরসীপ্রসাদের পিতা। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নামে ও খেতাবে রাজা। কিন্তু গাওয়াইয়া-সমাজ রামপুরের রাজা বলতে মুরলীপ্রসাদ ও নরসীপ্রসাদকেই বোঝেন।

আদত্ বরাবর এবারও নরসীপ্রসাদ নতুন্ গায়কের মর্যাদা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন এক আসর।

এমনিধারা আসরের প্রারম্ভে হল্‌-কামরাটি পুরোনো গালিচা, গোলাপপাশ, ফুলের গোড়ে, পান আতর, বাজাবাজনার এলাহি আয়োজন সব-কিছু দিয়ে সাজানো হয়—মধ্যপর্বে নতুন গায়কের গানকেই সম্মান-সহকারে শোনা হয়—জ্ঞানীগুণীরা অভিনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করেন—অন্তে দক্ষিণা ও পরিতোষিক উপহার দিয়ে ও নিয়ে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সম্মানিত বোধ করেন। গায়ক সৌভাগ্যবান হলে কিছু সুধীজন-মতামত শুনতে পান শ্রোতৃমণ্ডলের কাছ থেকে। এই মজলিসটি পরিচালনা করেন নাট্যকুশলী সূত্রধারের মতো স্বয়ং নরসীপ্রসাদ।

সৌভাগ্যক্রমে আনন্দের জীবনে তখন পরম শুভ যোগাযোগ ঘটেছিল গ্রহ-নক্ষত্রের ও দিনক্ষণের। তাই এই আসরেই নিমন্ত্রণ পেল সে। বড় খুশী হলেন বৃদ্ধ জমীর আলি খাঁ।

রাত ন'টা বাজতে সকলে সমবেত হল সভায়। সেই গাঢ়-লাল গালিচা—যৌবনের রং যার পঞ্চাশ বছর বাদে কাল্‌চে হয়ে এসেছে—সবুজ ও বাদামী রঙের ময়ূর-আঁকা নক্‌শার জেল্লাও কমে এসেছে—তার ওপর সেদিন যেরকম বৈঠক হল, তার জমজমাটের তুলনা হয় না। বারান্দার ও ঘরের মাঝখানে ডবল চিক ফেলা। তার ওপাশে বসেছেন অন্তঃপুরিকারা—ভেতরের ঘরে। আসরের গালিচার একপাশে জোড়া হারমোনিয়ম, সারেঙ্গী, তবলা জোড়ী ও তানপুরা। সামান্য দ্রাক্ষারস পানে প্রফুল্ল, অথচ স্থির ধীর ভাবে বসেছেন সয়াদিন খাঁ—ষাট বৎসর বয়স হল এবার। শ্যামকান্তি, ঈষৎ স্থূলকায়, বাঁকা করে মুরেঠা বেঁধেছেন, তর্জনী চিবুকে সংলগ্ন—অনামিকায় হীরকদ্যুতি প্রকাশমান। গণেশজী বসেছেন গুরু জমীর খাঁর পাশে। সাদাসিধা চেহারা গণেশজীর—পোশাক-আশাকে কোনদিনই শখ নেই। বর্তমানে গুরুর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত আছেন। তাকিয়াটা এগিয়ে দিলে একটু আরাম হয় কিনা···এলাচ

ও পানের ট্রে-টা হাতের কাছেই আছে কিনা···সমস্তই দেখছেন তিনি খাঁটি মুগা-কাপড়ের গলাবন্ধ কোট ও ধুতি প'রে জোড়াসনে বসে গৌরবর্ণ, প্রৌঢ় মহাবীরপ্রসাদ এদিকে ওদিকে তীক্ষ্ণ ও চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। দীর্ঘদিন গুণিসঙ্গ ক'বে আমীর আলি খাঁ সাহেবের নিজস্ব ঘরোয়ানার কৌশিক ও কানাড়া সংগ্রহ করেছেন তিনি। তাঁর গুরুব ধর্মভাই জমীর খাঁ সাহেব। তাঁরই সাগ্‌রীদ এই যুবকের গান শুনতে তিনি উৎসুক।

আনন্দ বসেছে একপাশে। ঋজু হয়ে একাসনে বসে সরল ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে এইসব গুণী পুরুষদের। ভয় করছে না তাব। কেননা, এই আসরে বসে এঁদের সঙ্গে জয়-পরাজয়ের পাল্লা দেবার কথা তো ওঠে না। জয় বা পরাজয়, কথা-দুটো একেবারেই বাতিল এখানে। এখানে গাইতে পাবাটাই তো পরম সৌভাগ্য নবীন গায়কের পক্ষে।

রাত্রি দশটা বাজল যখন, তখন আসরে এলেন নরসীপ্রসাদ। পাহাড়ের মতো বিপুলকায় গৌরকান্তি মহাদেবদর্শন পুরুষ—যোধপুরী ও পাঞ্জাবি পবেছেন, মাথায় বাঁকা কবে বসিয়েছেন সাদা চিকনের টুপী—যাব একপাশে ছোট চুনি-মুক্তার অলঙ্কার বসানো—প্রশস্ত সোনার চেন-সংযুক্ত পকেটঘড়ি ঝুলছে পকেটে। দ্রাক্ষারসের অভ্যস্ত আমেজে রক্তাভ-আঁখি রাজাসাহেব সকলকে অভিবাদন জানাতে-জানাতে ঢুকলেন। বয়োবৃদ্ধ জমীর খাঁ সাহেবের আনুষ্ঠানিক অনুমতিক্রমে শুরু হল গান।

প্রথমে একটু বিহ্বলতা এসেছিল আনন্দের—কিন্তু নয়ন নিমীলন-মাত্র মনের পটে ভেসে উঠলো একখানি তরুণ সুন্দর মুখ—মনে হল তাকে ভরসা দিচ্ছে সেই চোখ। বলছে—গাও আনন্দদা, ভয় কি ?

চকিতে স্থির হল ধ্যান। পরিপূর্ণ আত্মনির্ভরতায় কল্যাণের আস্থায়ীটি ধরলো—

'পিয়া বিন সখী কাল না পবত'

শ্রোতারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন ও কৌতুকের দৃষ্টি বিনিময় করলেন। কিন্তু মুহ্‌রার খেই ধরতে-না-ধরতে অতি মধুর ও জোরালো সেই অনন্যকণ্ঠ সুরবিস্তারচ্ছলে শ্রোতাদের শ্রবণবেদীমূলে অতীব বিনয়ে যেন সুর নয়, পুষ্পের অঞ্জলি ছড়িয়ে দিল—তারিফ উঠতে-না-উঠতে থেমে গেল মাঝপথে—বড় বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসলেন তাঁরা। স্বয়ং জমীর খাঁ টেনে নিলেন একটা হারমোনিয়ম।

সেই আসরেই আনন্দের প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়ে গেল। গান শেষ হল রাত তিনটেয়। তারিফ ও সমঝদারির বোল যেন আর শেষ হ'তে চায় না। প্রশংসাধন্য আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে বার বার নত হয়ে অভিবাদন জানাতে লাগল শ্রোতাদের। ভোজপর্বে পৌছুতে-পৌছুতে পুব আকাশে রং লেগে গেল।

ঘরে ফিরতে ফিরতে মহাবীরপ্রসাদ গণেশজীকে বললেন—কিন্তু একটা খেয়াল রাখতে হবে গণেশজী, এর সামনে গান গাওয়াও তো মুশকিল। ভাবুন কাশীর আখ্‌তারী আজ স্বর্গে গিয়েছে, তাই—নইলে তার গলার গান, সেই ফিরতের কায়দা, আমার মনে হল আমি কোন জিনের জিন্‌বাজি শুনছি। হলফ ক'রে বলুন, আমার কথা সত্যি কিনা!

গণেশজী বললেন—দেখুন বাবুজী, আমার আপনার দিনও তো ফুরিয়ে এল। এর সম্বন্ধে কি কথা বলব বলুন? এ যখন বাচ্চা ছেলে, কাশীর গলিতে গলিতে, ঘাটে ঘাটে যা শুনেছে তা-ই পাখীর মতো গেয়ে গেয়ে বেড়াতো। তখনই আমি ভেবেছিলাম, যদি এই ছেলেটাকে কোনদিন কেউ বশ করতে পারে, তো কাজের কাজ হবে।

—ফল দেখছেন তো গণেশজী···কি চমৎকার গলা, এমন অনেকদিন শুনিনি।

গণেশজী বললেন—আমি বড়ই খুশী হয়েছি। আর ওর কপাল দেখুন—তখনই কাশীতে এল দয়ালদাস, আশ্চর্য যোগাযোগ হয়ে

গেল। সাত দিনের মধ্যে জমীর আলি খাঁ ওস্তাদের সঙ্গ পেয়ে গেল। আমার আপনার কি ক্ষমতা। ভগবানের দয়া আছে ওর ওপর—তাই সব সহজে করিয়ে দিচ্ছেন—তবে কি জানেন, এখনই হল চিন্তার সময় —এখন ও নিজের কদর জানল। নাম যত হবে, জওয়ানি আছে, ততই অন্য সব লোভ আসবে। ও যতখানি ঠিক থাকবে, ততই ভালো হবে ওর। না কি বলেন?

সম্মতি জানালেন মহাবীরজী।

আগ্রার সেই জলসার পর তিন মাসের মধ্যে ফিরবার পরিকল্পনা ঠিক রাখা সম্ভব হল না। পনেরো দিনের আগে নরসীপ্রসাদ ছাড়লেন না—তারপর ইন্দোর যাবার প্রসঙ্গ তুলে রেখে মহাবীর-প্রসাদের সঙ্গে গয়াতে ফিরে এলেন ওস্তাদ। পথে এলাহাবাদে নামলেন তাঁরা। শেষ অবধি গয়াতে এসে মহাবীরপ্রসাদের আতিথ্যে বাঁধা পড়ে গেলেন ওস্তাদ। গণেশজী কিছুতেই এলেন না। বললেন —মহাবীরজীর আতিথ্য মধুর মতো। তাতে যে মৌমাছি আকৃষ্ট হবে, তারই পা যাবে জড়িয়ে। আমাদের পরিচয় তিরিশ বছরের পুরোনো। এখানে মধু ও মৌমাছি দুজনেই দুজনকে জানে—এবং তাদের সাক্ষাৎকার তো যে-কোন সময় হতে পারে।

গয়াতে দিনগুলি বড় আনন্দেই কাটল। বিষ্ণুপাদ মন্দিরের অবস্থানটি চমৎকার। অনেক নিচে প্রবহমান অন্তঃসলিলা ফল্গু। মন্দিরটি ওপরে। শ্রীকৃষ্ণের যে পদচিহ্ন দেখে প্রেম ও ভক্তিতে দ্রবচিত্ত হয়েছিলেন কঠোর শাস্ত্রধী শ্রীগৌরাঙ্গ, তাকে বুকে ধরে ধন্য হয়েছে প্রস্তর-মন্দির। ওপরে কারুকার্য উৎকীর্ণ। প্রভাতে মন্দির ধুয়ে দেয় দাসদাসী। সদ্য-ফোটা ফুলের গন্ধে সুবাসিত হয় বাতাস। মন্দিরের পথে পথে কতরকম বিপণিসম্ভার। ·গয়ার বিখ্যাত পাথরের বাসন, কাঠের খেলনা, গালার চুড়ি।

এই অঞ্চলেই মহাবীরজীর বাড়ী। তীর্থস্থানের কেন্দ্রে অবস্থিত হলেও, কোলাহল পৌঁছয় না সেখানে। আজ বুদ্ধগয়া, কাল ব্রহ্মযোনি, প্রেতশিলা, বরাবর গুহা—এই সব জায়গায় মহাবীরজীর গাড়ীতে যথেচ্ছ ভ্রমণ হয় সকালে। কোনদিন সকালে মহাবীরজীর বাগানে যাওয়া হয়। মহাবীরজীর ছেলে-ভাইপোদের সঙ্গে মিশে আনন্দও বালকের মতোই আচরণ করে। অড়হরের ক্ষেতে লুকোচুরি খেলে, গয়ালীদের পেয়ারাবাগান উজাড় ক'রে পেয়ারা চুরি করে—নদীর সামান্য জলে ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে স্নান করে। সন্ধ্যাবেলা যখন তারা বাড়ী ফেরে, শেরঘাটি ও ডোভার পাহাড়ের ছায়া এসে পড়েছে পথে। কর্ক গাছগুলিতে ফুটে উঠেছে শুভ্র, দীর্ঘবৃন্ত, পেলব ফুলের গুচ্ছ। আকাশে তারা ফুটছে। বড় উদাস, প্রশান্ত ও প্রসন্ন সন্ধ্যা। বাড়ী পৌঁছতে-না-পৌঁছতে আরতির ঘণ্টা বাজছে মন্দিরে, আসরে ফরাস পড়েছে, সারেঙ্গীর কানটা মোচড়াচ্ছে বুড়ো গোপাল, একটা-ত্নটো গাড়ী এসে থামছে দরজায়—প্রাত্যহিক অতিথিবর্গ আসছেন। আসর বসে রাত ন'টায়, শেষ হ'তে বারোটা, একটা, ত্নটো। ঘুম থেকে ওঠবার তাড়া নেই। এবার কলকাতা যেতেই হয় ব'লে রোজই কথা ওঠে, আবার কেমন করে যেন কথাটা চাপা পড়ে যায়।

এরই মধ্যে রাজাবাহাত্নরের আদেশ বহন ক'রে চিঠি এল। চিঠির মর্ম পড়ে ওস্তাদ চিঠিখানা বুকপকেটে লুকোলেন। আনন্দকে জানালেন তল্পিতল্পা বাঁধতে থাকো—এবার রওনা হ'তে হবে। এত তাগাদা কেন,—জিজ্ঞাসা ক'রে ধমক খেল আনন্দ। ভালোই লাগল আনন্দর। শিবের মারফত তাগাদা পাঠিয়েছে আর-একজন। চার মাস ধ'রে দেরি করবার কোন মানে হয়?

*

বাড়ীতে গাড়ীটা ঢুকছে যখন, তখন আনন্দ দেখে বাড়ী চুনকাম

হচ্ছে—মিস্ত্রী লেগেছে, বাঁশ খাটিয়ে মঞ্চ বাঁধছে। বাতি জ্বালিয়ে কাজ হচ্ছে রাতে। গেট থেকে গ্যাসবাতির নতুন পোস্ট পড়েছে।

সমস্ত পরিবেশটা একান্ত নতুন। তারই মধ্যে কেমন ক'রে খবর পেয়ে গেল শিব। দারোয়ানকে বকশিশ কবুল করা ছিল বোধহয়, সে-ই পৌঁছে দিল খবর। প্রায় লাফাতে লাফাতে এল শিব। আনন্দকে দেখে তার মহা ফুর্তি—একবার এ-হাত, আর একবার ও-হাত ধ'রে ঝুঁকে ঝুঁকে আনন্দ জানাল। তারপর বললো—আনন্দদা, বলো তো, কেন তোমাদের আসতে বলা হয়েছে ?

—কেন রে ?

—জাননা তো ! দিদির যে বিয়ে হচ্ছে।

—কি হচ্ছে ?

—বিয়ে হচ্ছে—বিয়ে—বিয়ে···

তারপর বলল—যখন বিয়ে ঠিক হল, দিদি খুব কেঁদেছিল। তোমার রেকর্ডটা এসেছে, জান তো ?

—শিব, দিদির সঙ্গে একবার দেখা হয় না ভাই ?

—কেমন করে হবে ? দিদিকে কি কেউ বেরুতে দেবে ? আমাকেই কাছে যেতে দেয় না।

গ্যাসের আলোতে কেমন যেন পাণ্ডুর দেখাল আনন্দর মুখ।

শিব বললো—তোমরা অনেকে গান করবে, তাই না ? বাইরে থেকে যারা আসবে, তাদের তুমি হারিয়ে দিয়ো আনন্দদা।

অন্যদের হারিয়ে দেবে সে ? নিজেই যেন কোথায় হেরে যাচ্ছে মনে হল আনন্দের। এ কথাই বা মনে হল কেন ?

কি গানটা রেকর্ড করেছিল আনন্দ ?

'মনে রেখো সখা এ সুখের দিন,
ভুলিয়া যাবে কি সবই ?
যদি নাহি থাকি সাথে বাসর জাগাতে—
তবু ভাতিবে প্রদীপ সে সুখ-নিশীথে
প্রভাতে হাসিবে রবি—
ভুলিয়া যাবে কি সবই ?'

কার অনুরোধে এই গান গেয়েছিল আনন্দ ? সে কি এর মধ্যেই দূর থেকে দূরান্তে চলে যায়নি ? কে কাকে ভোলে ? কে কাকে মনে রাখে ?

'—বারোটা বছরকে জীবন থেকে মুছে দিতে, আমি পারি, না তুমি-ই পার আনন্দদা ?' এ কথা কে বলেছিল ? হেমন্ত-সন্ধ্যার সেই প্রিয়স্মৃতি মনে করবার অধিকাবই কি তার আছে ?

অধিকার নেই। বাল্যসাথী ইন্দু আর তার নিজের মধ্যে একটা অন্তহীন ব্যবধান আছে। সে ব্যবধান ইটকাঠের নয়, সে ব্যবধান সমাজ-সংস্কার, জাত ও পদমর্যাদার। হাতে ছোঁয়া যায় না বলেই হয়তো সেই অদৃশ্য প্রাচীরখানা এতখানি দুর্লঙ্ঘ্য। নয়তো গুঁড়িয়ে দেওয়া যেতো।

॥ তিন ॥

আজ ভোর থেকেই শানাই ললিত বাজাচ্ছে করুণ সুরে। বরের বাড়ী থেকে গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এল।

জানলা দিয়ে সোৎসুকনয়নে দেখছিল বাহার। এ একরকম অদ্ভুত যোগাযোগ তার জীবনে। তাদের মহল্লার বারোয়ারী দাদী আখ্‌তারী বাঈয়ের কাছে জোয়ান জমীর খাঁর কথা শুনেছিল। যৌবনের জমীর আলি খাঁ আগ্রাওয়ালের সঙ্গে বেনারসওয়ালী

আখ্‌তারীর মন-বোঝাবুঝির পালা বেশীদূব এগোতে পায়নি। গুরুবহিন জোহ্‌রা বাঈ গোয়ালিয়রকার ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকদের প্রতি ঈষৎ অনুকম্পার ভাব ছিল জমীর আলি খাঁর। তবু স্বীয় প্রতিভায় যে আখ্‌তারী সঙ্গীতজগতের একটি স্থিরদ্যুতি জ্যোতিষ্কের আসন অর্জন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গীতের প্রতি জমীর খাঁর ছিল শ্রদ্ধা। আখ্‌তারী বাহারকে বড় ভালবাসতেন। তাঁরই কাছে বাহার শুনেছিল সিদ্ধগায়ক বালক আনন্দের কথা।

জমীর খাঁর বয়েস হয়েছে। তাঁকে নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য হবে, তা কি বাহার ভেবেছিল? গণেশলালজীর মারফত মিলে গেল বায়না। কলকাতায় নাকি কদরবান কয়েকটা ঘর আছে—এই জলসার মারফত আরো কিছু মিলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

জমীর খাঁকে ভেট করবার আগে সযত্নে প্রসাধন করল বাহার। মিঠাই পথ থেকে কিনে নিলেই চলবে। ফুল কিনতে মোহনকে পাঠাবে বাহাব, তো তাদের কথাবার্তা শুনেই বাচ্চা মালীটা বললো, সে কি কথা, এই বাড়ীতে এতো ফুল, তোড়া বেঁধে দিলেই চলবে। মোহনের প্রতি ইতিমধ্যেই শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছে ছোকরা। পানবিড়ি খাবার খরচটা দিয়ে তাকে বশ করেছে মোহন।

সকালে হলুদ-চন্দনের তত্ত্ব এসে গেছে। এবার শাঁখ বাজল অনেকগুলো। নতুন ছোপানো কাপড় পরে দাসীরা এনেছে মসলা, মিষ্টি, কাপড়-গয়নার তত্ত্ব। কাতার দিয়ে থালা হাতে চলেছে তারা। নায়েবমশাই গুনছেন পাশে দাঁড়িয়ে একান্ন, বাহান্ন, তিপ্পান্ন। সন্দেশের হাতী—মাছ, নৌকো, পুতুল, কলসী-কলসী তেল-ঘি—কত রকমের জিনিস। আউট-হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে বাহার—এমন সময় ফুলের তোড়া নিয়ে উঠে এল মোহন। সপ্রংশস দৃষ্টিতে দেখল বাহারকে। বোগোনভিলিয়ার পুষ্পিত আচ্ছাদনের পাশে

দাঁড়িয়ে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল বাহারকে। বললো—বাহারবাঈ, বড় খুবসুরৎ দেখাচ্ছে।

রুমাল দিয়ে তাড়না করল বাহার। বললো—সকালবেলাই বেফাঁস কথাবার্তা শুরু করেছ।

সিঁড়ি ধরে নামতে-নামতে হাসতে-হাসতে মোহন বললো—তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে তো ফাঁস লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কথাও কইব না একটা? তবে হ্যাঁ, আজেবাজে কথা হবে না—সে কথা তো কাশীতেই দিয়েছি। মনে যা থাকবে, তা তবলা বলবে আমার হয়ে, আমার আঙুলগুলো তবলাকে বোল ফোটাতে সাহায্য করবে শুধু—মঞ্জুর?

—মঞ্জুর।

বাহার ফিরে আসবার পর বৃদ্ধ ওস্তাদ চুপচাপ ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ।—এ-ই তাহলে বাহারবাঈ—রোহাত্‌গীদের ছেলে যার জন্যে বাড়ী তুলে দিয়েছে বেনারসে, আর আগ্রায় ব'সে নরসীপ্রসাদ যার সঙ্গে তুলনা করল আখ্‌তারীর। সত্যি কথা। একে দেখে ১৮৮০ সালের আখ্‌তারীর কথাই মনে পড়ল তাঁরও। গানের জগতে দুজনে সমতুল্য কিনা—তিনি জানেন না। আখ্‌তারী বাহারকে শুধু রেখাব-গান্ধারের তালিমই দিয়েছে, না তার সেই অনন্য দাদরা-ঠুংরীর নিজস্ব ঢং-টিও দিয়েছে, তার পরখ হবে সন্ধ্যাবেলা। প্রতিভাকে তুলনা করবেন—তেমন বেরসিক মানুষ নন জমীর খাঁ। আসলে সাদৃশ্য দেখছেন তিনি অন্য জায়গায়। আখ্‌তারীর মতোই বাহার হচ্ছে মেয়েদের মধ্যে জাতে নায়িকা। এদের চরিত্রে থাকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা। মানুষকে কক্ষচ্যুত ক'রে আনে নক্ষত্রের মতো এদের ভালবাসা। সে প্রেমে ক্ষুধা আছে উন্মাদনা আছে, দুঃখ আছে—শান্তি নেই, আশ্বাস নেই, বরাভয় নেই।

আখ্‌তারকে যতটুকু জেনেছিলেন তিনি, তাতে তাঁর এ-ই মনে হয়েছিল। জাতশিল্পী হয়েও সাড়া দিতে পারেননি জমীর খাঁ তার আহ্বানে। তাঁর চরিত্র অন্তর্মুখী, জীবনটাকে গভীর করেই দেখতে শিখেছেন তিনি। তাই শিল্পী আখ্‌তারকে শ্রদ্ধা করে দূরে সরে গিয়েছিলেন জমীর। তাতে পরিণামে আখ্‌তারের ভালোই হয়েছিল।

আজ বাহার এসে প্রথমেই আনন্দকে খুঁজল। দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। বাহারের চোখেমুখে, চলনে বলনে হাসিতে যেন উনিশবছরের আখ্‌তারকেই দেখলেন জমীর খাঁ।

আনন্দ কেমন যেন কোন্ গোপন দুঃখ মনে নিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাল থেকে। অপাপবিদ্ধ মন তার, নির্মল তার চরিত্র।

সমাজে শিল্পীর মর্যাদা বড় কম। তাই আনন্দকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে দিয়ে যেতে না পারলে তাঁর স্বস্তি নেই।

বাহারের সঙ্গে মেলামেশা তিনি চান না। আরো শঙ্কার কথা কি, বড় রূপসী বাহার। শুধু কি বাহার,—বেনারসী বাহার। এই উনিশ-শো ছাব্বিশ সালের কি যে আদত—শাড়ী, জ্যাকেট, চটি পরে এইসব মেয়ে, পাতা কেটে খোঁপা বাঁধে আধাবাঙালী ঢঙে। কি চমৎকার ছিল তাঁদের যৌবনের দিন? এই কোমরকে আরো সুঠাম দেখাবার জন্যে ঘাঘরা পরতো মেয়েরা, নাগরা পরতো পায়ে। ধিক্ বেনারসওয়ালী!

চম্‌কে উঠলেন জমীর খাঁ···ছি ছি, আফিমের মৌতাতে এ কি ভাবছেন তিনি!

জমীর খাঁ যখন আফিমের মৌতাতে ঝিমোচ্ছেন, তখন হগ-মার্কেট থেকে একরাশ গোলাপফুল নিয়ে ফিটনে উঠল আনন্দ। পেছন পেছন অনুগত লক্ষ্মণের মতো এল শিব। বাড়ী-ভর্তি নতুন মানুষ, হৈচৈ,

একবার দিদির কাছে গিয়েছিল। এক-গা গহনা পরে দিদি শুধু কাঁদছে মাকে জড়িয়ে ধ'রে—দেখেই সে সরে এল।

যে আঘাতের জন্য মন প্রস্তুত নয়, তাকে গ্রহণ করতে সময় লাগে। আনন্দেরও তাই হল।

ইন্দুর বিয়ের খবরটার জন্যে কোন মানসিক প্রস্তুতিই ছিল না আনন্দের। প্রথমটা মন তার বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর মনের মধ্যে দেখা দেয় একটা ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও জিজ্ঞাসা—কেন ইন্দু এ বিয়েতে রাজী হল? সন্ধ্যা-সকালের স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলির ভেতরে যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রাখবার প্রতিশ্রুতি ছিল তার কি কোন দামই নেই?

এই অবুঝ মনের জ্বালা নিয়েই আনন্দ দেখা করতে চেয়েছিল একবার। সেই দক্ষিণের ছাতে আর একবার দেখা হয় না? শুধু একবার?

ভয়, বাধা, লজ্জা ও কলঙ্কের একখানা সমুদ্র মাঝখানে। তাই ঠেলেই এল ইন্দু। মাকে বললো—আমি একলা থাকব কিছুক্ষণ।

মেয়েকে বিয়েতে রাজী করাবার অধ্যায়টা সরযূ ভোলেননি। আরো ভোলেননি য়োগীশ্বরের কঠোর আদেশ—ইন্দুর মতের বিরুদ্ধে যেন কিছু করা না হয়। ব্রত, আচার-নিয়ম যাঁর যা ভালো লাগে করুন গিয়ে।

তবু কি আসা যায়? সন্ধ্যাবেলা 'নৌকাবিলাস' দেখতে যখন সবাই ব্যস্ত, তখন এল ইন্দু—শিবকে সাথে নিয়ে।

কত অভিযোগই মনে নিয়ে এসেছিল আনন্দ, সব কথা তার হারিয়ে গেল। সত্যি বটে সর্বাঙ্গে বিভূষিত হীরের গহনা, নতুন কাপড় পরনে, একপিঠ চুল খোলা,—কিন্তু এ কোন্ ইন্দু? মুখ পাংশু, চোখ রোদনস্ফীত, দৃষ্টিতে গভীর হতাশা—যেন ডুবে যাচ্ছে ইন্দু, ধরবার একটুকু মাটি পাচ্ছে না।

—কিছু বলবে ?

প্রাণহীন কণ্ঠ। মাথা নাড়ল আনন্দ। না, সে কিছু বলবে না। সে সব বুঝেছে। বুঝেছে ব'লে এক-সমুদ্র হতাশা ক্লান্তি আর বেদনা এখনই তাকে ঘিরে ধরেছে। পাঁচিলে হাত রেখে দাঁড়ায় আনন্দ। ইন্দু বলে—আমিই বলে যাই···তুমি শোন···ভুল বুঝো না।

—'না'—মাথা নাড়ে আনন্দ। ইন্দু বলে—অনেক কষ্ট করে মন বেঁধেছি···তুমি আমায় সাহায্য করো·· মন ভেঙে দিয়ো না।

—কোন অমর্যাদা করব না, ইন্দু।

—'আমি জানি।' কথাটা প্রায় গলা থেকে ছিঁড়ে আনে ইন্দু। পাণ্ডুর মুখে চোখ-দুটো অদ্ভুত বড় দেখায়। বলে—বাবার কথা ঠেলতে পারলাম না·· দুর্বল মন · দাম দিচ্ছি

—'না।' আনন্দের কণ্ঠে আসে সময়োচিত সংযত দৃঢ়তা, সমবেদনা ও শ্রদ্ধা। সে বলে—সুখী হ'তে চেষ্টা কোরো ইন্দু। তুমি সুখী হলে আমিও সুখী হব। আমি বলছি এতে ভালো হবে।

—বলছ !

—হ্যাঁ ইন্দু। আমি অন্তর থেকে বলছি—তোর ঠাঁই অনেক উঁচুতে। তুই সে ঠাঁই পেলে আমার শুধু দেখে কত সুখ, বল্ ?

সহসা আনন্দকে প্রণাম করল ইন্দু। চকিত ও ত্রস্ত চরণে নেমে গেল সিঁড়ি ধরে।

এক-আকাশ তারার সঙ্গে আজও দক্ষিণা-বাতাস মাতামাতি করছে। পাঁচিলে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আঘাতটা সামলালো আনন্দ। শুধু তো ইন্দুর সঙ্গে বিচ্ছেদ নয়—আজ আনন্দ বুঝল ইন্দুর পেছনে রয়েছে একটা সুবিশাল শক্তি। অনেক টাকা, অনেক মানমর্যাদার কারবারী মানুষদের দিক থেকে দুস্তর বাধা রয়েছে। গাইয়ে বলে তাকে মানমর্যাদা দিতে কার্পণ্য করবে না তারা, যতক্ষণ সে নিজের সীমা না অতিক্রম করে। ইন্দুর সঙ্গে তার কোনদিনই মিলন হ'তে

পারবে না। তাহলেই সেইসব দুর্মদ শক্তিশালী মানুষগুলো তাদের ফারাক করে দেবে। আশমান-জমিন ফারাকের দুই সীমায় দাঁড়িয়ে এমনি ক'রে অনেক ইন্দুই অনেক আনন্দকে কামনা ক'রে ক'রে ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠার কালীদহে চিরতরে ডুবে নিষ্ফল হয়ে যাবে।

দুর্বল বোধ করল আনন্দ। এই চেতনার আঘাতে টলতে টলতে সে নেমে এসে গাড়ীতে উঠে বরানগরের পথ ধরল। খোলা-বারান্দায় তার খাটিয়াটায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসতে দেরি হল।

মাঝরাতের স্বপ্নে আবার সে ইন্দুকে দেখল। দেখল সমুদ্রের ওপর চাঁদ উঠেছে। ধূসর ও অপার্থিব এক পরিবেশ। বালির ওপর দিয়ে সে চলেছে, সামনে চলেছে ইন্দু। একবার মুখ পর্যন্ত ফেরাচ্ছে না ইন্দু। বলছে—আর আমাকে ডেকোনা আনন্দদা, আমি মরে গেছি। তবু আনন্দ অনুসরণ করছে আর প্রবল বাতাসে বালি উড়ে বিঁধছে পায়ে।

সকাল হ'তে ঘুম ভাঙল আনন্দর এক-আকাশ রোদের মাঝখানে। প্রথমেই মনে পড়ল আজ ইন্দুর বিয়ে। মনে পড়তেই কি রকম যে লাগল! হু-হু করে উঠল বুকটা। এমন করে যে বেদনা লাগবে তাই কি আনন্দ ভেবেছিল?

স্যুটকেসের কোণে টাকার থলিটা এমনিই পড়ে থাকে। আজ তুলে নিয়ে পকেটে ভরল আনন্দ। তার পরিচিত দুনিয়াটার এতটুকু অদলবদল হয়নি। তবু মনে হয় সব ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন একটা শূন্যতার বোধ। মনে হয় কেউ নেই তার। কোন বন্ধু, কোন স্ব-জন। অদ্ভুত নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। রাজবাড়ীতে যেতেই হবে একবার, কিন্তু কি যে করে আনন্দ, কে তাকে বলে দেবে?

তার ব্যবহারিক জীবনে কোনদিনই তো কাছাকাছি ছিল না ইন্দু। তবু মনে হয় ছিল। ছিল একজন, যে ছিল বলে আনন্দ জানত

সকালে উঠে কি করতে হবে। সারা দিন-রাত ধরে আনন্দের জীবন-যাপনের একটা মানে ছিল। আজ তাই এমন একা বোধ হয়। সে ছিল বলে আকাশ-বাতাস মধুর ছিল। প্রভাতে যোগিয়া গাইবার মানে ছিল। 'পিয়া কো মিলন কী আশ, দিন দিন বঢ়ত' ব'লে আস্থায়ীটির সুর-বিস্তারের ফাঁকে তার সুন্দর মুখখানা মনের পটে উঁকি দিয়ে যেত। গ্রীষ্মের সকালে কোনদিন এই বাগানবাড়ীতে পুকুরের ঘাটে তার পায়ের কাছের সিঁড়িতে বসে 'বৈঠি সুঁচি ব্রিজধাম, শূন লাগে মোরি দিন, ঘিরি আঈ বদরী' গেয়ে তাব চোখে জল এনে দেওয়া যেত। আজ সে-ই নেই। বসে আছে বটে রাজবাড়ীতেই। হাতীর দাঁতের চৌকিতে, অধিবাসের সাজে রাজেন্দ্রাণী সেজে, কিন্তু সে যে আনন্দের নাগালের অনেক দূরে। এতদূরে যে, এখন যদি কাছে গিয়েও দাঁড়ায় আনন্দ, তবু সে দূবত্ব ঘুচবে না। যে ছিল কৈশোরের সাথী, যৌবনের প্রেরণা, তাকে ওরা কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেল—একলা রইল আনন্দ। আর তো নতুন নতুন গানে সুর লাগাবার কোন মানে রইল না। আনন্দ আর ইন্দুর জীবনের অনেক ভালবাসাকে অর্থহীন করে দিয়ে রাজবাড়ীতে শানাই ধরেছে যোগিয়া। এত সুর থাকতে আর সুর পেল না ওরা?

ব্যথাতুর মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আনন্দ। বিয়ের খেলাতী জামাকাপড় রেখে এমনিই ধোপ জামাকাপড় পরল। চুল আচড়াল ভালো করে। কেমন করে যেন সে বুঝেছে, যদি সে নিজের যত্ন না করে, তার আর কেউ নেই।

ভোরবেলাই বরানগর থেকে চলে এসেছে আনন্দ। থলি-ভর্তি টাকা পকেটে নিয়ে সকাল থেকে ঘুরছে এখানে-সেখানে। গড়েব মাঠে খানিকক্ষণ ব'সে ছিল। মিউজিয়ামের সামনে তাকে দেখে গাড়ী থামিয়ে ধরে নিয়ে গেলেন স্বয়ং মহারাজা। স্নান-খাওয়া সময়মতো

না হলে পিত্ত-কফ কুপিত হয়, এই মর্মে ফারসী বয়েৎ আওড়ালেন। কণ্ঠ আবিষ্ট। সকালবেলাই কয়েক গেলাস হয়ে গিয়েছে মনে হল আনন্দের। একমাত্র মেয়ে, বিয়ে হয়ে চলে যাবে, মন খারাপ হয়েছে যোগীশ্বরের।

আনন্দের নিজের মনটাও এলোমেলো। এমনি সময়ই মাস্টারবাবু এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। আনন্দকে দেখেই বললেন—গাড়ীটা নিয়ে চলে যাও বাবা—হগ-মার্কেট থেকে ফুল আসেনি।

শিব গাড়ীতে বসেই জিজ্ঞাসা করল—আনন্দদা, তুমি কিছু দেবেনা দিদিকে? আনন্দ বললো—হ্যাঁ রে, দেবই তো, চল্ না।

মার্কেটে এসে দোকানে ঢুকে ফুলের কথাটাই মনে হল আনন্দের। দোকানে যতগুলো গোলাপ আছে নিয়ে গেলে কেমন হয়? সাহেব হাসল। বললো—বাবু, দোকানে কম ক'রে হাজারটা গোলাপ আছে।

—সব দাও।

—সব?

—সব।

থলি খুলে না গুনেই টাকা বের করে দিল আনন্দ। বললো—টুকরি ভরে দাও।

—রিবন? কোন কার্ড?

—না।

ফুলের টুকরি গাড়ীতে তুলে শিবকে আনন্দ বললো—ভাই শিব, তুই বাড়ী যা। এই টুকরিটা পৌঁছে দিস দিদিকে—কেমন?

—তুমি আসবে না আনন্দদা?

—পরে যাব। তুই চলে যা, শিব। পাতলা কাগজে ঢাকা গোলাপগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল শিব। বললো—এতো ফুল! শুধু ফুল কিনলে আনন্দদা?

—কেন রে, কাঁটাও তো রয়েছে। তুই বাড়ী চলে যা শিব—

জলসা বসল রাত বারোটায়। সেই পশ্চিমের বৈঠকখানা। আজ সমস্ত ঘরখানার ছাদ জুড়ে ফুলের মালার চাঁদোয়া পড়েছে। ফুলের আড়ালে ঢাকা পড়েছে আলো। ঘরের মেঝে ঢেকে পড়েছে গালিচা। ঘরের মাঝখানে বসেছে বাহার। নতুন বর বসেছেন যোগীশ্বরের পাশে। আজ বাসর-রাত। বরকে বাসরের বাইরে থাকতে নেই। তবে অন্তঃপুরিকাদের অনুমতি পাওয়া গেছে।

নিচু হয়ে মাপ চাইতে চাইতে ভীড়ের মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে ঢুকল আনন্দ; বসল ওস্তাদের পাশে। গুনগুন ধ্বনি উঠল খেতাবী ও কলাবন্ত্ শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে—আনন্দ! আনন্দ মিশ্র! নামটা শুনে কৌতূহলী বাহাব তাকাল। দেখল সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিধানে, বড় বড় চোখ, কপালের ওপর ঝুঁকে পড়েছে একগোছা অবাধ্য চুল—মাথা নামিয়ে বসে আছে। বাহারের চোখের দৃষ্টিটা অনুভব ক'রে আনন্দ একবার মাথা তুললো—দেখল বাহারকে।

গোলাপী ভারী বেনারসী পরেছে বাহার, ঘন ঘন পাতা কেটে বেণী বেঁধেছে, লেসের জ্যাকেট পরেছে, গলায় মুক্তোর মালা, আঙুলে আঙুলে আংটি, হাতভরা কালো কাঁচের চুড়ি—পোশাকে এতটুকু রুচি নেই। কিন্তু প্রতিমার মতো ওপরদিকে টানা বড় বড় দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ, অতি সুডৌল গৌর মুখ, পাতলা ঠোঁটের রেখায় রেখায় কৌতুক ও লাস্য, গ্রীবা বাঁকিয়ে এদিকে ওদিকে দেখবাব সুন্দর ভঙ্গী—রূপ আছে অনস্বীকার্য। একান্ত নিস্পৃহভাবে দেখল আনন্দ—যেন একটা মনোহারী জিনিসের রংবাহার দেখছে। সে ঔদাসীন্য বোধহয় বাহারও বুঝল। আনন্দ চোখ ফিরিয়ে নিল।

গান শুরু করবার নির্দেশ এল।

আর কারও দিকে নয়, সোজা আনন্দের দিকেই চেয়ে গান ধরল

বাহার—'য়ো রঙ্গবালে বালমঁা'—ভ্রূকুটি ক'রে চাইল আনন্দ। এ তো গান নয়, তাকে যেন আহ্বান জানাচ্ছে বাহার। বলছে, তোমার চেনা সুরেই ডাকছি—আমাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।

মন দিয়ে শোনে আনন্দ। স্মৃতির পর্দা ছিঁড়ে ফুটে ওঠে চোদ্দবছর আগেকার এক সন্ধ্যা। বারাণসীধামে শীতের সন্ধ্যা নেমেছে অসিঘাটের গলিটার ওপর আঁধার ক'রে। গন্ধমাদন পর্বত কাঁধে হনুমানজীর ছবি-আঁকা দোতলা বাড়ীটার নিচতলায় বসে আছে আনন্দ ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে। আখ্‌তারী বাঈয়ের দরাজ ও মেজাজী গলায় রাগ-ভূপালীর সুরবিস্তার তাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে—'রঙ্গবালে বালমঁা রঙ্গ ছোড়্'।

মনে পড়ে সে নিজে গাইছে সেই গান। বড় ভালো লেগেছে তার। মনে পড়ে প্রৌঢ়া আখ্‌তারী তার দুই হাত ভ'রে টাকা দিচ্ছে ; বলছে—বেটা, হয় তুই শয়তান, নয় কোন সিদ্ধ সাধক, আমার মহল্লা ছেড়ে চলে যা তুই···নয়তো কবে দেখব নিমকহারামি করে গানগুলো তোর গলায় গিয়ে বসেছে। তুই চলে যা !

এ গান আখ্‌তারের। তার নিজের দেওয়া সুর। এ গান কোথা থেকে পেল এই মেয়ে ? সহসা মনে অদ্ভুত অনুভূতি হল আনন্দের। সেই পথে পথে দিশেহারা শৈশব ও কৈশোর, অসিঘাটে স্নাননিরত পুণ্যার্থিনী মহারাষ্ট্রীয়া রমণীদের প্রসাদ পেয়ে আনন্দ ক'রে খাওয়া, নৌকো চুরি ক'রে রামনগরে পালিয়ে হৈ-হল্লা করা, সাধুমহারাজের কাছে বসে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান শোনা, কোথায় গেল সেইসব দিন ? সেই তো তার আসল জীবন, সেই বাঁধনছাড়া যাযাবর জীবন তাকে ডাকছে। এই মেয়েটির গানে সেই ডাক শুনতে পাচ্ছে আনন্দ। কি রকম গরম লাগছে তার। গলায় চেপে বসেছে পাঞ্জাবির ঘুনসিটা। খুলে ফেললো বোতামটা আনন্দ। মাপ চেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাঝরাতের লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে ঘুরতে ঘুরতে ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো ভোর রাতে আনন্দ পৌঁছেছিল গঙ্গার ধার। কতকগুলো মানুষ ঘুমোচ্ছিল পড়ে পড়ে। তাদের পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়েছিল আনন্দ। নিশানা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেমন করে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে, তেমনিই যেন মনটা তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমনই মনে হচ্ছিল তার। তার কারণ কি বাহার? বাহারের গান? নয় তো ইন্দু? ইন্দুর জন্যে কষ্ট হচ্ছে তার। ইন্দুর কথা মনে হতেই মনটা হা-হা করে উঠল। মনটা যেন একটা শূন্য ঘর। তার বন্ধ কপাটের মধ্যে ছাড়া পেয়ে কতকগুলো বাতাস যেন পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

সে-রাতে গান গেয়ে শ্রোতাদেব মাতাল ক'রে দিয়ে নিজেও মাতাল হয়ে গিয়েছিল বাহার। কস্তূরী-হরিণের মতো নিজের সুরের নেশাতেই সে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ফিরে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে শেষরাতের চাঁদখানাব দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের গাওয়া শেষ গানখানার কলি-ই মনে বাজছিল—মিঠি মিঠি বোল্—। কালো কাঁচের চুড়ি-পরা হাতখানা চাঁদের আলোয় দেখে নিজেকে বড় রূপসী মনে হয়েছিল বাহারের।

আলোকিত ফুলের বাসবের দিকে পেছন ফিরে জানলা দিয়ে সুপ্ত দুনিয়াখানার দিকে চেয়ে সে-রাতে জেগে ছিল ইন্দুমতী। শেষরাতের সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন বর। আকাশের দিকে তাকিয়ে ইন্দুব চন্দন-চর্চিত গাল বেয়ে পড়ছিল ফোঁটা-ফোঁটা জল। এই প্রথম একলা হল ইন্দু, এ কয়দিনের মধ্যে। মনে হচ্ছিল গত জীবনটাকে তো এই সন্ধ্যাতেই বিদায় দিয়েছে ইন্দু। নতুন জীবন শুরু হয়েছে তার। কিন্তু কি শূন্য মন, কি বিমুখ অন্তর। প্রাণের অতল থেকে উঠেছিল হাহাকার। আর একটা অবুঝ প্রশ্ন—এ কি হল? এমন তো কথা ছিল না।

তার অন্তরের সঙ্গে বাইরের সমাজ-সংসারের সত্তাটার কোন মিলই ছিল না। মনের কথাগুলোর জবাব অশ্রু হয়ে ঝ'রে পড়ছিল নীরবে। ততক্ষণে ভোর রাতের সাড়া জেগেছে বাড়ীতে। ক্লান্ত শানাইওয়ালা বিদায়ী নিশীথকে কাঁদিয়ে ভৈরোঁর আকৃতি পাঠিয়ে দিচ্ছে পুব আকাশের ঠিকানায়।

সকাল হ'তে গাড়ী ধরে আনন্দ চলে গিয়েছিল বরানগরের বাড়ী। ঘরগুলো চাবি-বন্ধ। তাই পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছিল অর্কিড-ঘরে।

হোমযজ্ঞ শেষ হয়ে খাওয়া শেষ হতে তিনটে বেজেছিল। গোধূলিতে যাত্রা করবে বরবধূ। তারই উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। তারই মাঝে ইন্দুর কাছে গিয়ে বসল শিব। একেবারে নতুন নতুন দেখাচ্ছে দিদিকে। শিবকে নিয়ে দিদি চলে গেল ওপরতলায় কাঁচঘরে। বললো—শিব, রেকর্ডটা এবার নিয়ে আয়।

কাঁচঘরের নানারঙা আলো পড়ে দিদিকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। শিবকে জড়িয়ে ধরে অনেক কথাই বললো দিদি। বললো আর কাঁদল। বললো—চিঠি লিখবি শিব, নইলে আমার খুব দুঃখ হবে। আবো বললো—আমি বড় দুঃখী রে শিব, আমার কথা কেউ বুঝল না!

শুনে বড় অবাক লেগেছিল শিবের। হীরেমুক্তো পরেছে দিদি, সবাই বলছে বড় ভাগ্যবতী ইন্দু। তার দিদি দুঃখী? না বুঝেই কেঁদেছিল শিব। তাদের খুঁজতে এসে বাবাও কেঁদেছিলেন খুব। কেঁদেকেটে চোখ মুছে নিজেকে সংযত করেই নিচে গিয়েছিল তার দিদি। সাজল যখন, বরণ আশীর্বাদ হল যখন, নিচে গিয়ে গাড়ীতে বসল যখন, আর কাঁদল না দিদি। ফিস্‌ফিস্‌ করে শিবের মামীমা-মাসীমারা বললেন—কি কঠিন মেয়ে! কি শক্ত প্রাণ!

যাবার সময়ে শাঁখে শানাইয়ে মেলা বসে গেল। সারি-সারি

গাড়ীর মিছিল বেরিয়ে গেল—তার পরে গেল ফুলে ঢাকা একখানা গাড়ী।

নিরানন্দ পুরী। বিষণ্ণ পরিবেশ। নিজের ঘবে এলেন যোগীশ্বর। আঁধার ঘরের কোণা থেকে মস্ত কুকুরটা উঠে এল। পায়ে মাথা ঘষে বোবা সহানুভূতি জানাতে লাগল। তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন যোগীশ্বর। যা করেছেন তাতে কল্যাণ হবে ইন্দুর—এই কথা বার বাব বলতে লাগলেন। কিন্তু মনটা অবাধ্য হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকল একটি চিত্রকে কেন্দ্র কবে। আসব ছেড়ে আধার পশ্চিম বারান্দা দিয়ে মাঝরাতে স্নানঘরে চলেছেন তিনি, হঠাৎ চোখ পড়ল বাসবের জানলায় দাঁড়িয়ে আছে ইন্দু। বেদনাহত মুখখানা তার, চোখভরা জল! অস্থিব হয়ে উঠলেন যোগীশ্বব। ঈশ্বর কোথায়? সামনে এবা কেউ থাকে না কেন? আলমারিটা নিজেই খুললেন। বোতল বের করলেন। হাতটা কাঁপছে। ঠোঁটটা ভাঙছে। ভাষাহারা কথাগুলো যেন একদল কিশোরীব মতো বুড়োকে দেখে পালিয়ে-পালিয়ে যাচ্ছে।

*

বেনারসের বাহার প্রমুখ যে কয়জন গুণীকে পাওয়া গিয়েছে, তাদের নিয়ে নিত্য জলসা চলে। আনন্দের ব্যবহাবে খুব হতাশ হয়েছেন জমীর খাঁ। মোটেই আশানুরূপ পরিচয় দিতে পারেনি সে। বেনারসের গণেশপ্রসাদ প্রমুখ কয়জন জ্ঞানীগুণী বন্ধুজনের সঙ্গ পাবার জন্য খাঁ-সাহেব সদলবলে আছেন বরানগরে। আনন্দের মুখে হাসি নেই, কথা নেই, চোখের নিচে কালি পড়েছে, মনটায় যেন একটা ভাঙচুর চলেছে তার। তাঁর দুঃখ এই যে, ছেলেটা সব কথা তাঁকে বলে না কেন। তিনি কি তার একান্ত হিতৈষী নন? খোলা-আসরে বাহারের প্রতি দু'দিন রূঢ় ব্যবহার করেছে আনন্দ। বাহার

যে গান গেয়েছে, তার রং কানা করে দিয়ে তারই দোসর গান গেয়েছে। হেসেছে বিদ্রূপ করে। আজকাল আনন্দের বেশভূষায় ঔদাসীন্য, নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই, নেশা যে করছে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন করে কেন যে নিজেকে সে বদনাম দিচ্ছে!

খাঁ-সাহেব কি জানবেন আনন্দের মনেব কথা। আসলে আনন্দের মনে নতুন নতুন সব ঝোড়ো ভাবনা-চিন্তা আসা-যাওয়া করছে। কলকাতা তার আর ভালো লাগছে না। প্রত্যেক দিন দরবারী কায়দায় দুরস্ত হয়ে আসরে হাজিরা দিতে তার ভালো লাগছে না। বেনারসের বাহারবাঈ কত চেষ্টাই করল তার মনোরঞ্জনের—কখনো সেজে, কখনো বিনা প্রসাধনে—তার সে-আহ্বানে এতটুকু সাড়া দিতে পারল কই আনন্দ? যে চিন্তাগুলো আজ দুর্বাব হয়েছে তার মনে, তা তো কোন মানুষকে কেন্দ্র করে নয়। তার মন অস্থির হয়েছে। কেমন একটা তাগিদ সে অনুভব করছে বেরিয়ে পড়বার জন্যে। এতদিন যাদের মধ্যে ছিল, কেমন যেন বুঝেছে আনন্দ যে, তাদের দুনিয়াতে তার কোন ঠাঁই নেই। কাশীর গণেশজীর মতো তার প্রতিষ্ঠা নেই। হীরেব আংটি, সোনাব চেন আর মেজাজ নেই। সে তো বেনারসের পথঘাটের ছেলে আনন্দ—এই কলকাতায় তার নিজের দুনিয়ার মানুষ একমাত্র বাহার। আজ তার মনে হচ্ছে, চলে যাই কোথাও। একবার সুযোগ এসেছিল, সেই কবে, যখন সাধুজী এসেছিলেন, আর একবার পুরীতে···কেন সে গেল না? কোন্ আকর্ষণে আটকে পড়েছিল সে? যে তাকে বেঁধেছিল পিছুটানে, সে চলে গেল কোথায়। তাকে বেঁধে রেখে গেল কেন?

পথ। ভোরের শহরের জল-ধোয়া পথ, রাতের ময়দানের পাশে নীল গ্যাসের বাতির আলোয় স্বপ্নমাখা পথ, দুপুরে মোষের ক্লান্ত বোঝা-টানার ভঙ্গীতে করুণ ও ক্লান্ত পথ, আগ্রাতে ধুলো-ওড়া তাজে

যাবার পথ, বোধগয়ার দিকে কর্ক-ফুলের গন্ধমাখা ছায়াবিসর্পী মন-উদাস-করা পথ। এই সব পথ আনন্দকে দিবারাত্রি ডাকে। এত দুর্মদ সে আকর্ষণ যে, তা ভুলতে বসে-বসে মদ খায় আনন্দ। মনে হয় তার ওস্তাদের আশঙ্কা বড় সত্যি। একদিন অনেক রাতে খাঁ-সাহেবের কাছে উঠে গেল আনন্দ। ছাব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে মাটিতে বসে ঝাঁকড়া-চুল-ভরা মাথাটা বুড়ো ওস্তাদের সামনে নামিয়ে রেখে কেঁদে ফেললো। বললো—আমি নিজেকে বড় ভয় পাই, ওস্তাদ। আপনি আমাকে ধরে রাখুন! স্থবির ওস্তাদ মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—চুপ যাও, বেটা। চুপ যাও। তুমি আমার কাছে থাকো। বলো তোমার কি দুঃখ।

—দুঃখ নয়, ভয়।

—ভয়?

—হ্যাঁ।

বুঝে ওস্তাদ সোজা হয়ে বসলেন। তিনি বুঝেছেন আনন্দের ভয় কোথায়। ভয় এই, যে কখন নিজের খেয়ালী নেশার টানে সব হয়-কে নয় করে দিয়ে সে বল্‌গা ছিঁড়ে ছুটে যাবে। এ ভয়ের নিরসন তাঁর কাছে কোথায়?

গেলে যেতে পারতো আনন্দ ইতিমধ্যেই। যাবার জায়গার তার অভাব ছিল না। কিন্তু সে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করা অর্থহীন জেনেও বসে ছিল পথ চেয়ে, কবে ফিরবে ইন্দু। অর্থহীন কতকগুলো ইচ্ছার দাস হয়ে থাকবার যে কি জ্বালা!

আট-দিনের-দিন আখরী আসর। সেদিনই ফিরবে ইন্দু। দুপুরের গাড়ীতে এল বর-কনে। বরণ করতে অন্তঃপুরিকারা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিশাল ওক-কাঠের সিঁড়ি, তাতে কার্পেট মোড়ানো। সামনে নামল বর-কনে। এদিকে অনেক মানুষের ভীড়ের মধ্যে আনন্দও ছিল। ইন্দু নামল—বিবর্ণ মুখ, চোখের নিচে

কালি। এত ফরসা ইন্দু? লাল চেলিতে তাকে এত সাদা দেখাচ্ছে? বরণের সময় কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে ছিল ইন্দু। তার পর উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। লাল কার্পেট মাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে ইন্দু—দেখতে লাগল আনন্দ। যখন আর দেখা গেল না, তখন সরে এল সে। ওদিকে তখন বিশ্রী একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ধুলো-পায়েই চলে যেতে চান জামাই। যোগীশ্বর নিজে এসে হাত ধরলেন। নিয়ে গেলেন ওপরে। নন্দনগরের কুমারদের কথার বড় একটা নড়চড় হয় না—তাই সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই চলে গেলেন তিনি। শ্রীনটপুরের বাড়ী ছেড়ে গ্রেটঈস্টার্ন-এ উঠলেন। যে কয়দিন থাকতে হয়, সেখানেই থাকবেন।

এসব খবর আনন্দ শিবের মুখে শুনল। আরো যে কত কথা ছিল, তা শুনেছিল সে অনেকদিন বাদে। সেদিন, সেই অনেক আশার দিনটা, যেদিন অনেক সুখে আনন্দে উচ্ছল ইন্দুকে দেখবে আনন্দ, দেখে বিদায় নিয়ে চলে যাবে কোথাও অন্য ঠিকানায়, সেদিন এইসব ঘটনার কোন মানেই বোঝেনি আনন্দ। নিজে বোঝেনি বলে শিবকেও সান্ত্বনা দিতে পারেনি। এখন আনন্দ পরিষ্কার বুঝল, যে আর তার না গিয়ে উপায় নেই। যেখানেই হোক চলে যেতে হবে। বোধহয় কোন কিছু ঘটেছে—তাই এই অসঙ্গত ব্যবহার ইন্দুর স্বামীর। এতে যে ইন্দুরও অপমান। ইন্দুর একটা লজ্জার সময়, এখন তার উপস্থিতির কি প্রয়োজন আছে? বিয়ের রাতে অগ্নি সাক্ষী করে দুজনে দুজনের সুখ-দুঃখ, মান-অপমানের সবটুকু ভাগ করে নিয়েছে। তাই স্বামীর অশোভন ব্যবহারে যে ইন্দুরও অপমান। এখানে আর তো তার থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। হঠাৎ আনন্দের সব প্রয়োজন এখান থেকে নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে যাবে তা তো আনন্দ জানত না। সে প্রস্তুতও ছিল না।

সন্ধ্যার জলসা আর বসবে না। মহারাজ নিজে অসুস্থ বলে

খবর পাঠিয়েছেন। শুধু সেটাই যে কারণ নয়, তা নিয়ে কথাবার্তা চলে চোখে চোখে। তবে সে শুধু বহিরাগতদের মধ্যে। এ বাড়ীর একান্ত শুভানুধ্যায়ী যাঁরা, তাঁরা কোন কথাই বলেন না।

বিভ্রান্ত ও বেদনার্ত মন নিয়ে আনন্দ চলে এল বরানগরে। ইন্দুর বিয়ে, তারপর এই ক'টা দিন, আজকের দিনটা, সমস্তটা জড়িয়ে ভাবতে গিয়ে বড় ক্লান্ত লাগল তার। হঠাৎ তার মনে পড়ল গত কয়দিন ভালো ক'রে ঘুম হয় না তার। মনে হ'তেই বারান্দায় খাটিয়াটার ওপর শুয়ে পড়ল আনন্দ। বড্ড ঘুম পাচ্ছে তার। আগে ঘুমিয়ে নিক, তারপর সে অন্য কথা ভাববে।

বাইরের প্রকৃতিতে মানুষের মনের আনন্দ-বেদনার কোন ছাপ-ই পড়ে না। আজও দুপুরে দেখ—বড় বড় গাছের ছায়ায়, মন-কেমন-করা ঘুঘুর একটানা ডাকে, তপ্ত আকাশে চিলের আর্তনাদে, শুকনো পাতা ঘুরে-ঘুরে পড়বার ভঙ্গীতে, মালীর মেয়ের পাতা ঝাঁট দেবার শব্দে কি নির্লিপ্ত উদাসীন কারুণ্য ছড়িয়ে আছে! এই মধ্যাহ্নের ছবিখানায় কোন চিরন্তনের।আভাস আছে। এমন দুপুর আরো অনেক এসেছে, আরো অনেক আসবে।

রাজবাড়ী থেকে আনন্দ কখন এল-না-এল, সে খবর কেউই যে করেনি এমন নয়। বর-কনে আসবার কোলাহলটা আউট-হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল বাহার। তার চেয়েও বেশী দেখছিল আনন্দকে। কাল রাত এগারোটায়, কারও দিকে না তাকিয়ে চোখ বুঁজে আনন্দ কেমন ডুবে গিয়ে 'বাবুল মোরা নইহারো' গাইছিল, সে কথা মনে পড়ল বাহারের। মনে পড়ল মহারাজ যখন তাকে কোন বাংলা গান গাইতে বললেন—যা রেকর্ড হয়ে এসেছে—তখন কেমন করজোড়ে ক্ষমা চাইল আনন্দ। তারপর মহারাজের চোখে চোখ রেখে শোরীউল্লার ধাঁচে কোন বাংলা গান ধরল আনন্দ—'ভালবাস না বাস, আমি তো বাসিব ভালো'—মনে হল এই সব

গানে গানে দুজনের মধ্যে কোন সংযোগ আছে। কি তখন, কি এখন, বাহারের আবার ভালো লাগল আনন্দকে ঘিরে যে একটা নিঃসঙ্গ ভাব আছে, সেটা। ভরা যৌবনে একজন গুণী গাওয়াইয়া মানুষকে যে এমন উদাসীন ও একলা দেখাতে পারে তা আগে জানেনি বাহার। তার সব চেষ্টাই বিফল হল এই উদাসীন পুরুষটির মন-আকর্ষণে। বিফল হল বলেই আরো ভালো লাগছে বাহারের। বাধা অনুভব করছে বলেই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ তার গভীর হয়েছে। নিরাশ সে হয়নি। আজ সন্ধ্যায় সে আবার যাবে। উনিশবছর বয়সের ভরা যৌবনের ওপর বাহারের অনেক ভরসা। শুধু কোনমতে একবার এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে পারলে ?—কি জীবন জেনেছে আনন্দ এই নিরুত্তাপ স্বচ্ছন্দ পরিবেশে ? জীবনের রং, রস, উত্তাপ তাকে চেনাবে বাহার।

তার দিবাস্বপ্ন ভাঙল এক চমকে। আনন্দ আসছে দ্রুতপদে। লাফিয়ে গাড়ীতে চড়ে বসল। বললো—বরানগর। বেরিয়ে গেল গাড়ী।

বরানগর ? সেই বাগানবাড়ী ? এ ভালোই হল। নির্জন পরিবেশে দুটো কথা-কইবার সুবিধে হবে বাহারের।

সন্ধ্যার মুখে বরানগরে পৌঁছল বাহার। তখন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে আনন্দ। ঘর খুলে দিয়েছে দরোয়ান ; বলেছে—আনন্দজী, আপনি স্নান করুন, চা খান,—তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে আনন্দ। আবার এল দরোয়ান। বললো—আপনাকে ভেট করতে এসেছেন একজন। আপনি এসে দেখুন।

ফরাসে বসে ছিল বাহার। আনন্দকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। বিস্মিত আনন্দ বললো—খাঁ-সাহেব তো কলকাতায়।

—আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব জী।

—কেন?

আনন্দের কণ্ঠের রুক্ষতা উপেক্ষা করে বাহার বললো—বসুন আপনি।

বসল আনন্দ। মামুলী সাদা চিকনের শাড়ী পরেছে বাহার। মাথায় দিয়েছে গুণ্ঠন। নাকের হীরের ফুলটা চিক্‌চিক্ করছে। গৌরকণ্ঠে কালো রেশমের সুতোয় বাঁধা সোনার তক্তি—সাদা মলমলের জামার ছোট্ট গলার নিচে দেখা যাচ্ছে। কানে শিকলি-বাঁধা মুক্তোর ফুল। বসনে ভূষণে শোভন সংযম। ঝিলিক দিচ্ছে শুধু চোখ। নীরবে, একাগ্রভাবে কয়েক লহমা আনন্দকে দেখল বাহার।

আনন্দ বললো—বলুন।

—আপনি বেনারস চলবেন বাবুজী?

—বেনারস?

—হাঁ বাবুজী, কেন নয় বলুন?

দুঃসাহসিক প্রস্তাব। বাহার ধীরে ধীরে বললো—আপনার নাম আমরা অনেকদিন জেনেছি। এবার আগ্রার জলসায় থাকতে পারিনি সে আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু বাবুজী, এর পরেও কভি-না-কভি তো আপনি যাবেন বেনারস, আমি আপনাকে জানিয়ে রাখলাম, যদি আসেন কখনো তো, গরীবের ঘরে দয়া করে আসবেন। বেনারসে আমার ঘরে জ্ঞানী-গুণীরা হরদম আসেন। কলাবন্ত্‌দের কৃপা পেয়েছি আমি, সাধ্যমতো তাঁদের সেবাযত্ন করি।

—আমাকে কেন?

—আমার বড় ইচ্ছা, বাবুজী। আর এ-ও শুনেছি আপনি বেনারসেরই ছেলে।

—আপনি আমার যত পরিচয় জানেন আমি আপনাকে তত জানি না।

হাসল বাহার। বললো—বাবুজী, আপনি আমাকে বে-সরম ভাবছেন কি? আপনার আমার এক-ই পেশা। আমি যদি আপনার খবর রাখি, সেটা তো স্বাভাবিক। গুণী মানুষ আপনি, আপনার খোঁজ-খবর আমাদের দুনিয়ার সবাই রাখে। আমি কে বলুন! বেনারসে আসবেন আপনি—আপনার গান শুনব আমরা, আপনার জলসা হবে, নাম আরও বাড়বে, যশ-খ্যাতি হবে—দেখে আনন্দ পাব আমরা। আমার নিজের কি মতলব বলুন?

পুনর্বার হেসে উঠে দাঁড়াল বাহার। বললো—কাল চলে যাব বাবুজী, তাই আজ-ই এলাম। যদি সময় করতে পারেন, আর বে-আদত না মনে করেন, তাহলে বলি, চলে যাবার আগে দেখা করে যাব।

চলে যাচ্ছিল বাহার—তখন দরজা রুখে দাঁড়াল আনন্দ। বললো—তামাসা করছ তুমি বাহার—? ভোলাচ্ছ আমাকে? কি বলতে চাও তুমি? সন্ধ্যাবেলা একা এসেছ, ওস্তাদ নেই জেনে, আমাকে ভেট করতে, কেন এইরকম বে-পরোয়া সাহস দেখাচ্ছ তুমি?

বাহার হাসল। বললো—আমি-ই আমার মালিক বাবুজী। আমার আচরণের কৈফিয়ত আমি দিই না। অভ্যেস নেই। তোমাদের পুব-দেশের আমিরী চাল আমি জানি না। কথা বলেছি, নিজের মন যা বলেছে তাই করেছি। মনে হচ্ছে ভুল করেছি। মাফ করো।

গাড়ীতে বসে ছিল মোহন। গাড়ী চলতে শুরু করলে পরে সে বললো—কি বাহার, যেমনটি চেয়েছিলে তেমন হল না?

জবাব দিল না বাহার। কিছুক্ষণ বাদে বললো—টিকিট খরিদ কর, কালই চলে যাবো।

—কাল-ই?

—হ্যাঁ। আর ধরমতলা ঘুরে চলো, মোহন।

—কেন বাহার ?

—মেজাজ দুরস্ত্ করব। রাজবাড়ীতে আর যাব না। মৌলালী চলে যাব।

মৌলালীর বাসাটা দিনকয়েক বন্ধ থেকে ধুলো পড়েছিল। দরজা খুললো বাহার। সন্ত্রস্ত হয়ে ঝাড়ু নিয়ে চাকরানী ছুটে এল। তাকে বললো—সোডা, বরফ আর পান নিয়ে আয়।

রাত দশটা বাজে। মমতা-ভরা কণ্ঠে মোহন বললো—বাহাব-বাঈ, এখন বন্ধ করি বোতল ? আব খেয়ো না।

—আমি বে-সামাল হইনি, মোহন।

—আমি জানি, বাহার !

সুর্মার কালি তো আছেই, আরো কালো দেখাচ্ছে চোখ, বেদনায় গভীব মনে হচ্ছে দৃষ্টি। ঘর্মাক্ত কপাল। ঘন ঘন নিশ্বাসে আন্দোলিত বুক। বাহার বললো—তুমি জান বড় অহঙ্কার আমার। আবো কি জান, লোকটাকে ভালো লেগেছে আমার। অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম, বড় অপমান হয়ে গেলাম মোহন !

সে রাতে যে ঝড়টা তুললো বাহার, তার ঝাপটায় অন্য একটা দুনিয়াও বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

বাহার চলে আসবার পর নানা অনুভূতিব দোলায় দুলছিল আনন্দের মন। সহসা বিপরীত সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তার জীবন। তার-ই মধ্যে এল বাহার। এল আর-একটা জীবনের আহ্বান বহন করে। কলকাতা তার নিজেরও আর ভালো লাগছে না। চলে গেলে মন্দ হয় না। এমনি একটা যোগাযোগের মুহূর্তে যে বাহার এসে পড়বে তার জীবনে, তা কে জানত্ !

সে-রাতে ঘুরতে ঘুরতে শেয়ালদহর মোড়ে মদের দোকানটায়

এমনিই ঢুকেছিল আনন্দ। নেশাটা যখন জমে উঠেছে তখনই দোকান বন্ধ হয়ে গেল। দিব্যি কেটে গালাগালি দিয়ে উঠে দাঁড়াল আনন্দ। বললো—নেশা লেগে গিয়েছে এখন কোথায় যাই বলো দিখিনি?

সেই সময়েই দোকানে এসেছিল মোহন; আনন্দকে দেখে এগিয়ে এসে সে হাত ধরল। বললো—মেরা সাথ চলিয়ে বাবুজী।

—কে তুমি?

—মোহন।

—কোন্ মোহন? গয়ায় সুরতি-খেলিয়ে এক মোহন আমার চল্লিশটা টাকা মেরে দিয়েছে···তুমি কে?

—না, বাবুজী। কাল রাতে রাজবাড়ীতে আমার তবলা শুনে সাপের মতো মাথা দোলাচ্ছিলে বাহার-বাঈয়ের গানের সুরে—মনে পড়েছে?

—বেশক্···

—তবে চলো।

মদ খেয়েছে আনন্দ আগেও, তবে সে সামান্য। বড় খারাপ লাগছিল তার। মাথার ভেতর আগুন জ্বলছিল, আর সমস্ত শরীরে বোধ হচ্ছিল অস্বস্তি। তা ছাড়া সবটাই কেমন এলোমেলো উদ্ভট মনে হচ্ছিল, অনেকটা স্বপ্নের মতো। নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে আনন্দ বলছিল—আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি··· কানে কানে বলি—কাল বাহার যে গাইল না? ও একদম ঠিক নেই। পহেলা তাল ছেড়ে ফির্তিতে সুর কায়েম করবার কায়দা আখ্তার কাউকে দেয়নি। কিন্তু তা চুরি করেছি আমি···আজ নয়, বারোবছর বয়সে। এখনো ইয়াদ আছে আমার।

বড় কড়া জান মোহনের, তবু সেও তো সে-রাতে নেশা করেছিল। তাই বললো—ইয়ার, বোলিতে নয়, সুরে তো লাগাও।

হাতে হাত গলিয়ে গান করছিল আনন্দ আর তাকে চালিয়ে-চালিয়ে ঠিক নিয়ে চলেছিল মোহন। গ্যাসের বাতিতে আলোকিত কানা গলিটায় ঢুকে কসাইয়ের দোকান পেবিয়ে শেষ বাড়ীখানায় ঢুকে সিঁড়ি ধরে উঠেছিল তারা দুজন। ঘরে তাদেব ঢুকতে দেখে চরম বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল বাহার। নেশায় কোমল চোখে একটু হেসেছিল আনন্দ। তারপরই সমস্ত শরীরটা বিশ্রী একটা অনুভূতিতে ঘুলিয়ে উঠেছিল।

তাকে সেবা করল বাহার। হাত-মুখ ধুইয়ে দিল—শুইয়ে দিল সযত্নে। নেশার ঘোরে আনন্দ বললো—কেন আমার জন্যে এত করছ বাহার ?

—এ কিছু নয়, বাবুজী।

তর্জনী তুলে আনন্দ বলেছিল—একটা দামী কথা বলি, এমন কিছু কোরোনা যাতে পরে তোমার লজ্জা হয়।

—আপনি ঘুমোন, বাবুজী।

—এমন কিছু কোরো না যে, পরে ছেড়ে যাবাব সময় ব্যথা লাগে।

—একি কথা বাবুজী ?

—কিছু নয়। খেয়ালী কথা। বড্ড মদ খেয়েছি কিনা, তাই মাতলামি করছি, বাহার—দেখো, কাল কত লজ্জা পাব। শুধু আজ—

—চুপ করুন বাবুজী, ঘুমোন !

পরদিন অনেক বেলায় যখন ঘুম থেকে উঠল আনন্দ, তখন সমস্ত ঘটনাটা সাদা চোখে দেখে বুঝল তার গুরুত্ব কতখানি। তাব আচরণকে কে কি ভাবে দেখবে ভেবে মাথায় চেপে বসেছিল গুরু ভার। সাদা চোখে, না বাহার না মোহন, কাউকেই ক্ষমা করতে পারেনি আনন্দ।

কোন অভিযোগ করেননি জমীর খাঁ। বলেছিলেন—এখানে থাকবে তুমি, মহারাজের আশ্রয়ে, এই আশা করেছিলাম আমি। তবে কেউ কারও জীবন গড়ে দিতে পারে না, আনন্দ। তুমি যা ভালো বুঝেছ তাই কোরো। তুমি সুখী হলেই আমার ভালো লাগবে।

—আপনি বুঝলেন না ওস্তাদ—

—আমি তোমায় যত বুঝেছি আনন্দ, তুমি তা ভাবতেও পারবে না। কেন ভুল বুঝব বলো? ভালো লাগছে না তোমার, ক'দিন ঘুরে আসতে ইচ্ছে আছে, ঘুরে এসো। আমি টাকা দিচ্ছি তোমায়। কাশীতে গণেশ আছে জানো, প্রহ্লাদ আছে, তুমি স্বচ্ছন্দে তাদের কাছে থাকতে পারবে।

শিষ্যকে আশীর্বাদ করতে গলা ভেঙে এল বৃদ্ধ জমীর খাঁর। বললেন—তোমার যখনই মনে হবে, আমার কাছে ফিরে আসবে। সঙ্কোচ কোরো না। অনেক ইচ্ছে ছিল আনন্দ—কিন্তু না, নিজের ইচ্ছে জানাব না—

পরে যোগীশ্বর দোষ দিলেন ওস্তাদকে। বললেন—বাহারের সঙ্গে কেন যেতে দিলেন আনন্দকে?

ভ্রূকুঞ্চন করে তিরস্কার করলেন ওস্তাদ। বললেন—আমি যেতে দিলাম কি বলছ? ওর নসীব-ই ওকে নিয়ে গিয়েছে। তুমি ওকে তো চেন না যোগীশ্বর—বাঁধা পড়বার ছেলে ও নয়। শুধু ওকে ঘর-ছাড়া করবে বলে নসীব সেজে এসেছিল মেয়েটা।

গুরুজীর কাছ থেকে এসে আবার বাহারের কাছে গিয়েছিল আনন্দ। বলেছিল—আমি তোমার কাছেই আবার এলাম, বাহার।

সমাদরে বসিয়েছিল তাকে বাহার। বলেছিল—আমি তোমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করব.না বাবুজী।

—কিন্তু কেন বাহার? আমি তো তোমাকে ভালবাসিনি।

—তবে নিজের মনকেই জবাব শুধোও বাবুজী।

—দেখ বাহার, তোমাকে কত কম জানি···তবু যেতে হচ্ছে··· ভেব না আমার খুব ভালো লাগছে বাহার···আসলে আর তো উপায় নেই বাহার—এ বোধ হয় আমার নসীব। তুমিই আমাব নসীব বাহার···নইলে এমন যোগাযোগ হয় না। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল···

—কি হল বাবুজী?

চোখ নামিয়ে নিয়েছিল আনন্দ। বলেছিল—কিছু নয়।

যাবার আগে শিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই কেমন হয়ে গেল আনন্দ। কিছুই বোঝেনি শিব—আনন্দেব কাছ থেকে অবুঝের মতো প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল শুধু,—বলো কবে আসবে।

—আসব রে, আসব। পালিয়ে যাচ্ছি নাকি?

—তবে চলে যাচ্ছ কেন?

—বেড়াতে যায় না মানুষ?

—বার বার যায় না।

মহারাজ আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন—এবার শিবকে বোর্ডিং-এ রেখে দেব। বড় সঙ্গীহারা হয়ে পড়ল বেচারা।

সেই রাতে যখন ট্রেন ছুটে চলেছে, বাইবের দিকে তাকিয়ে মনটা হাহাকার করে কেঁদেছিল আনন্দের। লোহার চাকার শব্দে ঘা খেয়ে মনটা তার বার বার ফিরে যেতে চেয়েছিল। বুঝে, বাহার বলেছিল—কি হল বাবুজী?

—কিছু না, বাহার। কথা বলো।

—কি বলব বলো।

—যা হয় বলো।

তখন অনেক কথাই বলেছিল বাহার। বলেছিল—আনন্দের

সহায়তায় সে ধন্য হবে। বড় বড় জলসা, যশ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, অর্থ—অনেক ছবি এঁকেছিল সে, মিঠে মিঠে ছোট-ছোট হিন্দুস্থানী কথা দিয়ে। শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল আনন্দ।

জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল বাহার।

রাশি রাশি আঁধার কেটে এগিয়ে চললো ট্রেন।

॥ চার ॥

আনন্দ যে বাহারের সঙ্গে চলে গিয়েছে, সে কথা জানত না ইন্দু। কথা উঠলো বাইরে। মুখে মুখে ছড়ালো। রাজবাড়ীর অন্দরে এসে পৌঁছলো যখন, তখন দোতলায় ইন্দুর ঘরের বন্ধ দরজার পাহারাতেও সে-কথা ইন্দুর কানে উঠতে বাধল না। শুনে ইন্দু পাথর হয়ে গেল। একি লজ্জায় তাকে ফেলে গেল আনন্দদা!

রাজবাড়ীর অবস্থা তখন এমনিতেই মুহ্যমান। নন্দনগরের কুমারের কাছে অপমানিত হয়েছেন যোগীশ্বর। নিজে যেচে গেলেন তিনি হোটেলে। বললেন—যেমন ব্যবস্থা চাইবে, তেমনিই ক'রে দেবো আমি। আমার জামাই হয়ে তুমি হোটেলে থাকবে? সে যে বড় লজ্জার কথা হবে।

তাতেও মানলেন না কুমার। ভদ্রতার ত্রুটি হল না। সবিনয়ে নিবেদন করলেন তাঁর অক্ষমতা। জানালেন, নিয়মমতো তিনদিন কাটলেই তিনি ইন্দুকে নিয়ে ফিরবেন।

বলতে মাথা কাটা গেল—তবু যোগীশ্বর বললেন—জয়শঙ্কর, তুমি কি রাগ করেছো ইন্দুর কোন ব্যবহারে? আমাকে খুলে বলো।

বড়ঘরের আদবকায়দা মুখোস এঁটে রাখে মানুষের মুখে। তাই জয়শঙ্করের মনের কথা বোঝা গেল না। শুধু বললেন—তাহলে ঐ কথাই রইলো।

বাড়ীতে ফিরতে ফিরতে যোগীশ্বরের মনে হল শিরা যেন ফেটে পড়ছে। এমনধারা অপমান তিনি জীবনেও হননি। কুলশীল দেখতে গিয়ে ইন্দুর কোন সর্বনাশ করেছেন কি? দুশ্চিন্তার মেঘ কালো হয়ে নামলো সদাপ্রসন্ন মুখে।

বাড়ীতে এসে সরযূর কাছে কিছু না বলে ইন্দুর কাছেই গেলেন যোগীশ্বর। বললেন—আমায় খুলে বল্ কি হয়েছে?

এই প্রশ্ন শুনে-শুনে লজ্জায় দুঃখে মরে গিয়েছে ইন্দু। সবাই জিজ্ঞাসা করেছে তাকে। দশজনের কৌতূহল তাকে পীড়া দিয়েছে। মনে ঘা লেগেছে তার। রাজকন্যা-রাজঘরনীর জাঁকজমকের আড়াল থেকে ফাঁকিটা যেন ধরে ফেলেছে সবাই। নিজেই ফাঁকিতে পড়েছে ইন্দু, কিন্তু সে অসম্মানের কথা কি বলবার? তা ছাড়া মনের বন্ধন যত আলগাই হোক, আচার-অনুষ্ঠানের বিয়ে-সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ইন্দুর রক্তে। স্বামীর সম্পর্কে কি বলতে পারে সে? ইন্দুর শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে যে-সব মন্তব্য করেছেন জয়শঙ্কর, সে কথাগুলো মনে করতেও লজ্জা বোধ হয় ইন্দুর। তা ছাড়া তার বাক্সর নিচের সেই রেকর্ডখানা নিয়ে কত কথা উঠলো নন্দনগরের বাড়ীতে। আনন্দ মিশ্র কে? ইন্দুব দাসীদের কাছ থেকে পরিচয় সংগ্রহ করে সে কি হাসি-ঠাট্টা! জয়শঙ্করের কটু মন্তব্যগুলো ইন্দুব সহজাত আত্মসম্মান আর শুচিতাবোধকে আহত করলো।

অনেক কথাই বলতে পারতো ইন্দু। বললো না। যোগীশ্বরের দিকে তাকাল না অবধি। তাকালে পরে তার চোখ-ই সব বলতো যোগীশ্বরকে। হয়তো তীব্র অভিযোগ করতো তার চোখ। বিনা-কথায়-ই প্রশ্ন করতো—এ কি করেছ? মনপ্রাণের কথা জানতে চাইলে না। জানাবার সাহস-ও আমার রক্তে নেই। তবু শিক্ষাদীক্ষা কুলে শীলে এমন মানুষ নির্বাচন করলে না কেন, যাকে আমি সহজেই শ্রদ্ধা করতে পারি? বিশ্বাস করতে পারি? বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা,

এর সাহায্যেই সুখী করতাম আমি স্বামীকে। আর সেই পথেই আমারও সুখ আসতো। অপরকে সুখী করাই যে সবচেয়ে বড় কথা তা কি আমি জানি না? তোমার নির্বাচন আমি মাথায় করে নিতে চাই। কিন্তু সেখানেই যে বাধা। শ্রদ্ধার পাত্র যদি অশ্রদ্ধেয় হয়, ছোট হয়, তাহলে আমার কি রইল? আমাদের বংশের মেয়েদের নাকি কুল, শীল, বিদ্যা ও মর্যাদা দেখে বিয়ে দেওয়া হ'ত। দারিদ্র্যকে ভয় পেতেন না তাঁরা। ভয় করতেন নীচতা, সঙ্কীর্ণতা। হাতে লালসুতো বেঁধে তার গৌরবে রাজার রানীকেও তুচ্ছ করবার সাহস, সে-ও তো আমাদের দেশের মেয়ের-ই গল্প। এখন যদি জানতে চাও কি হয়েছে, কিচ্ছু বলতে পারব না আমি। তেমন করে বলবার মতো কিছু ঘটেনি। তবু যা হয়েছে তাতেই বিভ্রান্ত আমি। কথা নেই আমার।

ইন্দুর মুখে সে-কথার কোন জবাব না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন যোগীশ্বর। বললেন—তুই বলবি না ইন্দু? বুঝতে পারছিস্ না কত কষ্ট হচ্ছে আমার?

এ কথার জবাবে ইন্দু যা বললো তাতে হতবাক্ হয়ে গেলেন যোগীশ্বর। পিতার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ইন্দু বললো—আনন্দদা কেন চলে গেল বাবা? তাকে কি তুমি চলে যেতে বলেছ?

—ইন্দু!

ভর্ৎসনা নয়, বিভ্রান্ত বেদনার ডাক।

ইন্দু বললো—বলো বাবা, চলে যেতে বলেছ তুমি তাকে?

এই অকুণ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক মেয়ের সঙ্গে যোগীশ্বর-ই স্থাপন করেছেন একদিন। আজ সহসা তিরস্কার করতে বাধল তাঁর। তবু তীব্র হল কণ্ঠ—এ কথার কি এই জবাব ইন্দু?

মাথা নাড়ল ইন্দু। না। সে-ও জানে, এ কথার জবাব এটা হয় না। যোগীশ্বর তাকে কাছে ডাকলেন। মাথায় হাত দিয়ে মুখখানা

তুলে ধরলেন। গম্ভীর অথচ করুণ কণ্ঠে বললেন—খাঁ-সাহেবের বুকে দাগা দিয়ে, আমাদের কারও পরোয়া না করে সে চলে গিয়েছে, ইন্দু। আমাকে অবধি একবার জানায়নি। আমি জানলে তাকে যেতে দিতাম না। ধরে রাখতাম। আমি জানলাম যখন, তখন সে যাবে ব'লে তৈরি।···তার কথা ভেবে তুই দুঃখ করিস্ না।

বলতে বলতে বালকের মতো অসহায় হলেন যোগীশ্বর। মেয়ের হাত-দুটি ধরে বড় দুঃখে বললেন—বল্ মা, তুই দুঃখ করবি না?

পরম দুঃখের মধ্যেও পিতার মর্মবেদনা দেখে মমতা হল ইন্দুর। বড় বড় শান্ত চোখ-দুটিতে জল ভরে এল। মাথা নাড়লো। জানালো—না। সে দুঃখ করবে না।

মেয়ের কাছ থেকে এই আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি নিতে গিয়ে মরমে মরলেন যোগীশ্বর। বড় চাপা মেয়ে ইন্দু। নিমিষে আত্মস্থ হল। বললো—তুমি আমাকে নন্দনগরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো, বাবা। তিন দিন তো হয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল যখন ইন্দু, তখন যোগীশ্বর বুঝলেন ইন্দুর মনের বয়সটা বেড়ে গিয়েছে রাতারাতি। আরো বুঝলেন, তার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের সবে শুরু হল।

ঘরে ব'সে নিজের মনটাকে বাঁধল ইন্দু। সংযত করলো। তা হলে, যত কথা কানে এসেছে সবই সত্যি? চলে গিয়েছে আনন্দদা, সকলের কথা উপেক্ষা করে? কেন গেল? রূপের আকর্ষণে? বড় রূপসী বাহারবাঈ, সেই জন্যে? খাঁ-সাহেব যখন বাধা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—এত করে শিখিয়েছি তোমাকে, সব সাধনা লুটিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছ আনন্দ? ও-ই তোমার সব হল? তখন আনন্দ বলেছে—ও আমার কেউ নয়। আপনি বিশ্বাস করুন। ওর টানে আমি যাচ্ছি না। তবু ও-ই আমায় নিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বাস করেছিলেন খাঁ-সাহেব। বলেছিলেন—তুমি সুখী হও। তাতেই আমার ভালো লাগবে।

পরে ইন্দুর বাবা বলেছিলেন—আপনি বিশ্বাস করলেন খাঁ-সাহেব, ও সুখী হবে? কেন যেতে দিলেন?

খাঁ-সাহেব বললেন—তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না যোগীশ্বর—তবে এসব মানুষ ঘর ছাড়বে বলেই জন্মায়। ও মেয়েটা ওকে বাঁধতে পারবে ভেবেছ? কোনদিন নয়। এখনকার যোগাযোগ এমন হল যেন ও-ই আনন্দর নিয়তি। টেনে নিয়ে গেল তাকে।

খাঁ-সাহেব তো কোন অভিযোগ করেননি? কেমন করে ইন্দু বিশ্বাস করবে আনন্দ দুর্বলচিত্ত, ভ্রমরের মতো অবিশ্বাসী? নিজের মনে মনে তো ইন্দু জানে আনন্দ ছোট নয়, নীচ নয়। তবু কেন এমন করল? এখানেই ইন্দু আনন্দকে দোষ দিল। বিয়েটাকে মানতে পারল ইন্দু। বিচ্ছেদটা স্বীকার করতে পারল। আনন্দদা কেন বুঝল না কত দুঃখ হল ইন্দুর? বুঝে, তার কতো ধীরভাবে চলা উচিত ছিল। তা না ক'রে, নিজের খেয়ালের বশে এ কি করলো আনন্দদা? মনে মনে সব জানে ইন্দু, তবু বাইরে তো কিছু বলবার মুখ তার রাখল না আনন্দদা। সবাই এখন বলবেই আনন্দ দোষী। বলবে, পথ থেকে বেদে কুড়িয়ে এনে সোনার খাটে বসালেও সে আদর বোঝে না—পথ-ই বেছে নেয়। বলবে—দেখ, কেমন রক্তে রক্তে উচ্ছৃঙ্খলতার ডাক। বাঈজীকে দেখেই এতদিনের স্নেহ-মমতা সব ভুললো।

আনন্দদা তাকে বড় দুঃখ দিলো। যত দুঃখ পেল, সবটাই ফিরে দিলো। এখন আর কি করবে ইন্দু? এখন সে ফিরে যাবে স্বামীর ঘরে। বিবাহের মন্ত্রগুলি মনে করবার চেষ্টা করলো ইন্দু। স্থির করলো জয়শঙ্কর যেমন মানুষই হোক, তাকে মানাতে চেষ্টা করবে ইন্দু। কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করবে। তাতে তার সুখ হোক-না-হোক, অপরে দেখে শান্তি পাবে।

এত ভেবেও তবু অশ্রু ফেললো ইন্দু। বিশ বছরের মন। শুধু পরের কথা ভেবে বাকী জীবনটার জন্যে মুখোমুখী হতে হবে? বড় দুঃখে কাঁদলো ইন্দু। কাঁদলো আনন্দের কথা ভেবে। কাঁদলো তার নিরুদ্বেগ, সুখী কুমারী-জীবনের জন্যে। সহজ বন্ধুত্ব ও প্রীতিতে সমুজ্জ্বল সেই বকুল-গন্ধ-মন্থর দিনগুলি এত সহজে গল্পকথা হয়ে যাবে, শুধু স্মৃতিতে বাসা বাঁধবে তারা, জীবনে আর ফিরে আসবে না —এ বড় দুঃখের কথা।

এতো কথার কিছুই জানল না বাইরের মানুষ। পরদিন নিজে সাজল ইন্দু। বেনারসী-হীরে-মুক্তোয় ঝকঝক করতে লাগল মাথা থেকে পা অবধি। শুধু চোখে একটা দীপ্তি দেখলেন যোগীশ্বর। সে কি হীরে-ঠিক্‌রোনো আলো? পায়ের চরণপদ্ম যেন তেমন করে বাজল না। সে কি রুপোর ঘুঙুরে স্থতো জড়ালো চেলীর? অথবা শ্রীনটপুরের বাড়ীর মেঝেটা আজ-ই ইন্দুর পায়ে বড় কঠিন বোধ হচ্ছে বলে?

নিজেকে ক্ষমা করতে পারলেন না যোগীশ্বর। আর জয়শঙ্করের পাশে বসে চোখ নামিয়ে রাখলো ইন্দু। তুললো না রাজবাড়ীর দিকে।

মেয়েরা বলাবলি করলো—এর মধ্যেই মায়া কেটেছে ইন্দুর। মন বসেছে নন্দনগরের ঘরে।

॥ পাঁচ ॥

বেনারসে বাহারের যে প্রতিষ্ঠা তার পেছনে রোহাত্‌গীদের ছেলে কুন্দলালের অনেকখানি ভূমিকা আছে। অন্য কেউ হলে কুন্দলালের একনিষ্ঠ প্রেম প্রত্যাখ্যান করতো না নিশ্চয়। কিন্তু বাহার সে-জাতের মেয়ে নয়। বন্ধন দেখলেই তার মন বিদ্রোহ করে। কুন্দলালের অনেক প্রতিশ্রুতিতেও বাহার স্বীকার করেনি। বলেছিল—আমি

গান গাইব, আপনি খুশী হলে শুনবেন। এর চেয়ে বেশী অধিকার আমি দিতে পারব না।

কুন্দলাল উপহার-স্বরূপ যে বাড়ীখানি দিল তা অনেক প্রতিবাদেও ফিরিয়ে নিল না। কুন্দলালের বাবা বুড়ো রোহাত্গীর ভয় ছিল, এই সুযোগে মেয়েটা না জানি কি সুবিধে করে নেয়।

বাহারের ব্যবহারে বুড়ো বিস্মিত হল। খবর নিয়ে জানলো, কিছুই নেয়নি বাহার। তার ছেলের জীবন-যৌবন, ধন-মানের অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান করেছে। এ বাড়ীটার দাম বড়জোর হাজার পাঁচেক টাকা। রোহাত্গীর একঘণ্টার রোজগার। বাহারের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে বুড়ো রোহাত্গী গানের মুজরার ছলে হাজার-টাকার তোড়া পাঠাল বাহারকে।

সবই বুঝল বাহার। তার সমগোত্রীয়া সখী ছোটি, চতুরাণ, সুহাগণদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে বললো—কত আর দিয়েছে বলো! সামান্যই। তবে পাঁচ-সংখ্যার টাকা।

মোহন বললো—এটা কি হল বাহার? অকারণ ওদের তুমি শত্রু বানাচ্ছো?

—ভালো লাগে। মেয়েদের লড়িয়ে দিয়ে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে, মোহন।

তার পর বাহার মনের সাধে সাজাল তার বাড়ী। বাহারবাঈয়ের প্রয়োজন জেনে স্তাবক ভক্তরা পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি করে উপহার দিয়ে গেল এসে। যেমন তেমন করে হোক ঐশ্বর্যের প্রচারটা বড় ভালবাসে বাহার। তাই ঘরের মেঝে ঢাকলো মোটা গালিচায়। গানবাজনার সাজপোষ সাজালো থরে থরে। রূপোর পিকদান, সোনার মিনে-করা বাটা কিনলো। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রমাণ মাপের আয়না টাঙালো। যাতে চলতে-ফিরতে এক বাহারকেই একশো ভাবে দেখা যায়।

এই বাড়ীতেই আনন্দকে এনে তুললো বাহার। খবর ছড়িয়ে পড়লো শহরে। কলকাতায় গান গাইতে গিয়ে বাহার ধরে এনেছে আনন্দ মিশ্রকে। শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলো সবাই। সবে আনন্দের নাম শুনেছে তারা। সে নামের সম্পর্কে তাদের অসীম জিজ্ঞাসা।

বাহার-ই নিমন্ত্রণ করলো এক জলসা। জানালো আনন্দকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে সে। আনন্দের সম্পর্কে তার উচ্ছ্বাস শুনে শুনে অনেকেরই মনে নানা কথা জেগেছে তখন। তাবা ঠাট্টা করে বললো —যাব। দেখে আসব তোমার আনন্দ মিশ্রকে।

এমন একটা মন নিয়ে বেনারসে এল আনন্দ যে, তার দিশা নেই। বাহার তাকে আতিশয্য করে আদর-যত্ন করলো। সুরতিয়াকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই নিলো পরিচর্যার ভার। ভাবে ভঙ্গীতে তার নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করলো আনন্দকে। বাহারের নিজের প্রসাধনেও এক এক দিন হীরে বা পোখরাজ দেখা দিলো। খুব দামী আতরের গন্ধে সুবাসিত হল তার কাপড়, মুখ, চুল।

কিন্তু আনন্দের মোটে দৃষ্টিই নেই সেদিকে। বাহারের প্রতি তার কোন বিশেষ মনোযোগও দেখা গেল না। পুরোনো জীবনের টুকরো-টাকরা খোঁজ ক'রে সে এখানে সেখানে ফিরল। বাহার তার সঙ্গে আলাপ করাবে বলে নিমন্ত্রণ করলো মানুষ-জন। সে রাতটা আনন্দ হয়তো ঘাটে শুয়েই কাটিয়ে দিলো। ফিরল না ঘরে। সকাল হ'তে ফিরলো যখন, বাহারের ক্ষুণ্ণ অভিযোগ শুনে অবাক হয়ে গেল সে। সারারাত বাইরে কাটিয়েছে বলে রাগ করেছে বাহার? বাহারকে আঘাত করতে তো সে চায়নি। তার চেয়ে নয় সে আর ফিরবে না এখানে। অন্য কোথাও থাকবার বন্দোবস্ত করবে?

শুনে কথা হারালো বাহার। এ কথা তো সে বলতে চায়নি? এ কিরকম মানুষ?

বাহার নয়, মোহন-ই বোঝাল আনন্দকে। মোহনের মধ্যে কোন একটা দরদী মনের খোঁজ পেল আনন্দ। মোহন যখন বললো—ও রকম করে বাহারকে বোলো না তুমি। ও দুঃখ পায় মনে।

শুনে আনন্দ বাহারের কাছে মাপ চেয়ে এল। না, সে ঘা দিতে চায়নি।

পুরোনো দিনের মানুষদের খোঁজ করতে গিয়ে, একদিন আখ্‌তারের নাতনী চতুরাণের ঘরে গিয়ে উঠলো আনন্দ। আখ্‌তারের কথা তুলে সহজেই আনন্দকে বশ করলো চতুরাণ। চতুরাণ বয়সে বাহারের চেয়ে অনেক বড়। বাহারের ওপর টেক্কা দেবার লোভটুকু সে সামলাতে চাইলো না। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে সেখানে রয়ে গেল আনন্দ পুরো দিন। সন্ধ্যাবেলা সেখানেই গান গাইল আনন্দ।

খবর পেয়ে বাহারের মাথা কাটা গেল। তার চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী চতুরাণ। সে কি আর বোঝে না, যে তারই অতিথির সঙ্গে পুরোনো সখ্যতার জের টেনে মাখামাখি করছে চতুরাণ শুধু বাহারকে ছোট করবে বলে?· এসব কথা বলতে গেলে হেসে ফেললো আনন্দ। বললো—কি বলছো বাহার! ওর দাদী ওর হাতে দিয়ে রুটি-মিঠাই দিতো, খেতাম আমি নিচের রাস্তায় বসে। জামা ছিল না, জামা বানিয়ে দিতো চতুরাণ। ওরা কত দয়া করেছে আমাকে একসময়। এখনও কত ভালবাসে আমাকে, তা জান?

—সে তো অনেকদিনের কথা, আনন্দ। এখন তুমি আর সে-আনন্দ নেই। এখন তোমার কত নাম যশ। এখন যে ও তোমায় ডেকে ডেকে সেই ভিখারী জীবনের কথা শোনায়, সে শুধু হিংসে ক'রে। আর তুমিই বা সে-সব কথা বল কেন? কে মনে রেখেছে সে কথা? আমার লজ্জা করে।

আনন্দ উল্‌টো বুঝল। বললো—ও, আমি খুব আমির হয়েছি কলকাতায় থেকে, তাই না? আমার আগেকার জীবনের কথাগুলো স্বীকাব করতে তোমার লজ্জা করে? আমার কিন্তু এতটুকু লজ্জা করে না, বাহার। তোমার খারাপ লাগে ব'লে আমাব জীবনটা তো আমি পাল্‌টাতে পারব না বাহার। তার চেয়ে চলে যাব আমি।

বেগে বেরিয়ে গেল আনন্দ। নৌকো ভাড়া কবে আদি-কেশবের মন্দিরে গেল। গিয়ে দুই রাত কাটিয়ে দিল। কেমন করে খবর পেয়ে মোহন ফিরিয়ে আনল তাকে।

তাবপব থেকে আনন্দেব সম্পর্কে আরো সতর্ক হল বাহার। মান-অপমানের বোধ বড় কম আনন্দর। অনেক কিছুই জানে না আনন্দ। অথচ জীবন দিয়ে বাহাব জানে, যশ এবং অর্থ পেতে হলে কতটা জাগতিক জ্ঞান দরকার।

বেনাবসে আনন্দকে পরিচিত করবার জন্য প্রথম দিন গাওয়াইয়াদের যখন ডাকলো বাহাব, তখনই বুঝল সে, যে এ নিয়ে অনেক কথা উঠবে।

হল-ও তাই। আনন্দকে গ্রহণ কবতে কোন বাধা ছিল না গণেশজী বা প্রহ্লাদলালের। কিন্তু বাহাবের সঙ্গে চলে এসেছে আনন্দ, খাঁ-সাহেবের কথা মানেনি—এসব শুনে বীতরাগ হলেন তাঁবা। মনে হল বড় খেলো আচবণ করলো আনন্দ। শেষ অবধি বাহারেব সঙ্গে? ঠুংরী গানে বাহারের দখল স্বীকার করেন তাঁরা। কিন্তু বাহারের রূপ-যৌবনকে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। অনেক সুনাম-দুর্নাম এই সুন্দরী মেয়েটির নামে জড়িয়ে রয়েছে।

জমীর খাঁর শিষ্য হিসাবে আনন্দ খানিকটা স্নেহ পাবার দাবি নিয়েই গেল গণেশজীর বাড়ী। তাঁর ব্যবহারে. আন্তরিকতার উত্তাপ যেন কম মনে হল। বরঞ্চ খানিকটা শুষ্ক সৌজন্য দেখালেন

গণেশজী। তার পর বললেন—তুমি কলকাতায় ফিরবে কবে? এখানে এসেছ ছ'মাস হল।

—ফিরব না।

শুনে অবাক হলেন না গণেশজী। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বললেন—খাঁ-সাহেবের মতো গুরু পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না, আনন্দ।

—জানি, গণেশজী। তবু আমার যাবার উপায় নেই।

আনন্দের নির্লজ্জতা দেখে স্তম্ভিত হলেন গণেশজী। মুখে আর কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মন তাঁর বিরূপ হল।

এতদিন এক ধরনের জীবন জেনেছে আনন্দ। সে-জীবনটা পেছনে ফেলে এল যখন, প্রথমেই এই নতুন জীবন গ্রহণ করতে বিমুখতা ছিল তার। তা ছাড়া বাহারের জীবনযাত্রা দেখে ভালো লাগেনি আনন্দর। মনে হয়েছিল, ঠুনকো জীবনযাত্রা বড় ভালবাসে বাহার। অলঙ্কার জাঁকজমক এসবের প্রতি বড় আকর্ষণ তার। তুলনা করা উচিত নয়, তবু তুলনা করতো আনন্দের মন। সে-তো রাজার মেয়ে। সে তো এমন করে ভালবাসেনি বাইরের উপকরণ-গুলোকে! বাহারকে বলতো—বাহার, তুমি গুণী মানুষ। গানবাজনা ভালবাস। বাইরের ঠাট-বাটকে এত বড় করে দেখ কেন?

—আমার এই আদত, আনন্দ।

তারপর আনন্দ দেখল বাহারের নিজের শ্রেণী সম্পর্কে একটা গর্ব আছে। সে যে-ঘর থেকে এসেছে, যা তার শিক্ষাদীক্ষা—সেগুলোকে অস্বীকার করে না বাহার। দেখে, এই স্বাতন্ত্র্যবোধটা তার ভালো লাগলো।

আস্তে আস্তে এই জীবনকে ভালবাসতে শেখাল বাহার। গান-বাজনা, মহফিল, আসর, জমায়েত, এখানে ওখানে ঘোরা—এগুলোতে অভ্যস্ত হল আনন্দ।

এইসব জীবনের সঙ্গে বাহারও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ানো। বাহারকে স্বীকার করতে নিজের দিক থেকে প্রবল বাধা ছিল আনন্দের। নিজের মধ্যে একটা বিমুখতা অনুভব করতো আনন্দ। এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য জোর ক'রে বাহারকে জড়ালো আনন্দ। বাহার যেমন করে চাইলো ঠিক তেমন করে নয়। খানিকটা বিতৃষ্ণা, বিক্ষোভ নানারকম মিশ্র অনুভূতি নিয়ে।

আনন্দের ভালবাসা-ই চেয়েছিল বাহার। পেলো যখন, দেখল এ প্রেম তাকে ক্ষত-বিক্ষত করলো। সুখের চেয়ে বেদনা দিলো বেশী। আঘাত ক'রে-ক'রে বাহারের কাছ থেকে আদায় করলো প্রতিদান। দুঃখ ও বেদনার সংঘাতে ফুটলো রক্তগোলাপ। পাপড়ি, সৌরভ আর কাঁটা—তিনটেই সত্যি সেই প্রস্ফুট কুসুমে।

॥ ছয় ॥

রাত এগারোটা। নেমির্চাঁদের গলির দোতলা বাড়ীটার ওপরের ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। জানালায় হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছে বাহার।

দাসী সুরতিয়া ব'সে ব'সে ঢুলছিল। বাহার বললো—তুই ঘুমো গিয়ে যা।

—তুমি যাবে না ?

—তুই যা সুরতিয়া।

নিচু গলায় বকবক করতে করতে চলে গেল সুরতিয়া। এই উঠ্‌তি সময়ে, একটা ভবঘুরের জন্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঁচটা বছর নষ্ট করল বাহার। দেখে দেখে আর সহ্য হয় না সুরতিয়ার।

পাঁচটা বছর। এই পাঁচটা বছরের কথাই ঘুরে ফিরে স্মরণ করে বাহার। কি দিল আর কি পেল। ভাবতে গেলে মনে আঘাত পায়

বাহার। আনন্দ তো তাকে এইজন্যেই তিরস্কার করে। বলে—হিসেব, হিসেব, শুধু হিসেব করো বাহারবাঈ! এত ছোট তোমার প্রাণ? মেয়ে মাত্রেই কি এমনি?

সমাজের যে স্তর থেকে বাহার এসেছে, সেখানে জীবনটাকে নগ্নভাবেই জেনেছে সে। নৃত্যে লাস্যে আর সঙ্গীতে সুধা বিতরণ করাই যার পেশা, ছাব্বিশ বছরের জীবনে অবিমিশ্র অমৃতের স্বাদ সে কমই জেনেছে। কণা কণা গরল মিশিয়ে প্রসাদ পেয়েছে সে জীবন দেবতার প্রসারিত অঞ্জলি থেকে। আঘাত দিতে আর নিতে জানে বাহার পোড়-খাওয়া সৈন্যের মতো। তবু আনন্দের অভিযোগে মর্মে মর্মে জ্বালা ধরে গিয়েছে তার। বলেছে—হিসেবী আমি? আমার প্রাণ ছোট? তার কণ্ঠের আকূতি আনন্দ শুনেও শোনেনি। আরো নির্মম হয়ে বলেছে—একখানা খোলা আশমানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টেনে এনেছিলে বাহার, মনে পড়ে? অথচ মনটা তোমার এত ছোট যে, দিলের লেনদেন নিয়েও তুমি শাকসবজির মতো হিসেব কষতে চাও, ছি!

নির্মম আঘাত। শিকারকে ঠিক জায়গাতেই বেঁধে। লক্ষ্যে এতটুকু ভুল করে না আনন্দ কখনো। কালো হয়ে যায় বাহারের মুখ। বলে—তুমি, তুমি আমাকে এই কথা বললে আনন্দ?

—বলব না? একশো বার বলব। তোমার ভারী তেজ বাহার··· তোমাকে কি আমি ভয় পাই, যে বলব না?

এমনিধারা অনেকগুলো কথা বলেছে আনন্দ নেশার ঘোরে। তখন চোখের জল মুছে ফেলে বাহার সযত্নে তার হাতমুখ ধুইয়ে দিয়েছে। শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়। পাশে শুয়ে অভ্যাসবশে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে আনন্দ। তাতে ধরা দেয়নি বাহার।

সকালবেলা মাপ চেয়েছে আনন্দ। মোহনকে ডেকে তার সামনে হাজারটা কসম খেয়েছে। জীবনটা আজ থেকে যে নতুন ছাঁদে চলবে, তাতে কোন সন্দেহ আছে কি মোহনের? থাকে তো সে বেইমান।

হাসতে হাসতে সায় দিয়েছে মোহন। তখন কয়টা দিন খুব হৈ-হৈ চলেছে। ঘরদোর সাফ-সুতরা করছে সুরতিয়া। খোঁজখবর গিয়েছে সঙ্গতীয়াদের কাছে। সন্ধ্যেবেলা আলো জ্বলেছে বৈঠকখানায়। জলেভেজা তাজা ফুলের মালা দিয়ে গিয়েছে মোহিনী ফুলওয়ালী। গলিটা জুড়ে টাঙ্গা আর একা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বৈঠকখানার বাইরে নাগরা-জুতোর ভীড় জমে গিয়েছে। ভেতরে বসেছেন অতিথিরা। তবক-মোড়া মিঠা পানের ছোট ছোট ফুল-খিলি রুপোর থালায় সাজিয়ে দিয়েছে বাহার।

আসর ভাঙলে পরে কোনদিন আনন্দ আর সে বসেছে ছাদে। আনন্দের কোলে মাথা রেখে শুয়েছে বাহার,—তার চুলগুলো বিস্রস্ত করে দিয়ে আনন্দ গেয়েছে—

'ব্রজবিলাসিনী রাই ব্রজ-নাগরী
যমুনা-পুলিনে এলে সাঁঝের বেলা
বলো এ কোন্ খেলা—
ঘরে ফিরে যাও লয়ে খালি গাগরী…'

কখনো তারা দুজন ভেট করতে গিয়েছে গণেশরামজীকে। ফুল, ধূপ, আতর নিয়ে গিয়েছে। বিনীত নিবেদনে ক্ষমা চেয়েছে বাহার। জানিয়েছে, তাঁর স্নেহচ্ছায়া থেকে যেন বঞ্চিত না হয় আনন্দ।

মৃত গুরুজী জমীর খাঁ সাহেবের কথা স্মরণ করে আর্দ্র হয়েছে গণেশজীর মন। আনন্দকে কতখানি স্নেহ করতেন তিনি—সে কথা মনে ক'রে, আনন্দের আচরণের সমস্ত ত্রুটিই মার্জনা করেছেন তিনি।

তাঁর মধ্যস্থতায় আনন্দের ডাক পড়েছে বৃন্দাবনপুরের বাড়ীর দোলের জলসায়, ধেনুবাবুর বাড়ীতে, পান্নাওয়ালা বিনায়কজীর মহলে।

পকেট ভ'রে টাকা নিয়ে ফিরেছে আনন্দ, বাহারের জন্যে কিনে এনেছে ফুলের মালা। প্রসাধন করে অধীর চিত্তে ঘর-বার করেছে

বাহার। তাকে টেনে এনে পাশে বসিয়েছে আনন্দ। মোহন এনেছে হারমোনিয়ম। কানা সিতাপ ধরেছে তবলা, আর বাহারের সকৌতুক তিরস্কার উপেক্ষা করে গান ধরেছে আনন্দ।

গান শেষ হয়েছে যখন, তখন পাথরের রাস্তা ধুয়ে দিচ্ছে ভাঙ্গী। ঠাণ্ডা ভোরাই বাতাসে মন্দিরের ধ্বজাগুলো উড়ছে। পুব আকাশের রংটা ফিকে হয়ে এসেছে।

এই রকম চলেছে দশ দিন, পনেরো দিন, কখনো কখনো এক মাস। মনে ভেবেছে বাহার, এই দিন-ই বুঝি চিরস্থায়ী হল।

আনন্দকে ঘরে রাখবার দাম দিতে হয়েছে বাহারকে। টাকা নিতে বা দিতে আনন্দ সমান উদার। রোজগার করলে এনেও দিয়েছে যেমন, বাহারের কাছে চেয়েও নিয়েছে সে অবুঝের মতো। বাড়ীতেই এসেছে তার বন্ধুবান্ধব। জলসা, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, নেশাও চলেছে। বাহার আর মোহনের সযত্নসঞ্চিত পুঁজি লুটে নিয়ে গিয়েছে আনন্দ। 'নেই' বললে মানেনি। দেয়াল-আলমারিটার দেরাজের ওপর তার শিশুর মতো বিশ্বাস। হাত দিলেই টাকা পাওয়া যাবে। টাকা না থাকলে মোহন চলে গিয়েছে নেমিচাঁদের ছেলে নেকলালের গদ্দীতে। পকেট-ঘড়ির সোনার চেনটা বের করে দিয়েছে বুড়োকে। জিনিসটার ওজন নেকলালের মুখস্থ। টাকা বের করে দিতে দিতে বলেছে—এবার নিয়ে ক'বাব হল বলুন ভাইসাব?

সেই টাকায় এসেছে পানীয়, আনুষঙ্গিক আহার, বরফ, সোডা, পান। মনের কোণে যদি বা কোন কাঁটা বিঁধে থাকে, সে ব্যথা মনে-মনেই রয়ে গিয়েছে। গানের পর গানে রাতটাকে ভ'রে দিয়েছে আনন্দ। যে কণ্ঠের গান শুনে আগ্রা, বেনারস ও দিল্লীর সঙ্গীত-সমাজ সেলাম জানিয়েছে, তার আকর্ষণে যে সারারাত ধরে বাড়ীর সামনের রাস্তায় ভীড় জমে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

আসরে তারিফ উঠেছে ঘন ঘন। চিবুকে হাত রেখে বঙ্কিম ঠাটে বসে শুনেছে বাহার। আসর ভাঙলে পরে বাহারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রসগ্রাহী শ্রোতা। বলেছেন—বাহারের দূরদর্শিতার ফলেই আজ আনন্দকে পেয়েছেন তাঁরা। নামকে সার্থক করেছে আনন্দ।

ভাঙা আসরে বাসর বসেছে তার পর। রাত তৃতীয় প্রহর। নিবু-নিবু ল্যাম্পের আলো। ঝোড়ো বাতাস উতলা করেছে বাহারের চুল। সে-রাতে হৃদয় কথা বলতে চেয়েছে পরজ-পঞ্চম-সুরের ভাষায়। কথা খুঁজে পায়নি আনন্দ। বলেছে—বাহার, তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিই, না ?

—'না তো।' অন্তর থেকে বলেছে বাহার। বলেছে—তুমি পাশে থাকলে আমার কষ্ট কিসের বলো !

ছোট ছোট বোলিতে মধুর স্বরে কত আশ্বাসের কথাই যে বলেছে বাহার ! দুরাশায় বুক বেঁধে, ভবিষ্যৎটাকে সোনালী রঙে এঁকে দেখিয়েছে আনন্দকে। বলেছে—আনন্দ যদি একটু মন দেয়, তাহলে তার সব দিক ভালো হবে। ডাক পড়বে সর্বত্র। গানের আরো কদর হবে।

আনন্দ সব কথা হয়তো শোনেওনি। বাহারকে ত্রস্তে জানিয়েছে তার সম্মতি। বলেছে, সব করবে সে। শুধু এখন চুপ করুক বাহার। এসব কথা কি এখন বলবার ? হিসেব-নিকেশ করে আর যাই চলুক, বাঁচা চলে না। তার চেয়ে আর-একটা বোতল আনুক বাহার। ঢেলে দিক, ভুলিয়ে দিক তাকে।

একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে বাহার। গেলাসটা তুলে দিতে বলেছে—কেন, সাদা চোখে তাকে ভালবাসতে পারে না আনন্দ ? তার সঙ্গে নিরালা হলেই কেন দরকার হয় চোখটাকে রঙিন করবার ? বাহারের মধ্যে কি রঙ খুঁজে পায়না আনন্দ ?

এ কথার জবাবে আনন্দ বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়েছে। তারপরেই হেসে বলেছে—তুমি-ও নাও।

ঈষৎ আমেজ লাগতেই বাহারের মনের গোপন দুঃখ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বলেছে—আনন্দ, যেমন করে চেয়েছিলাম তেমন করে তো তোমাকে কিছুই দিতে পারলাম না। চেয়েছিলাম দিনের পর দিন তুমি বড় হয়ে ওঠ···। কিন্তু পারলাম কি? চেয়েছিলাম যে সেটাও আমার স্পর্ধা তাই নয়? এসব কথা যখন ভাবি···

আনন্দ বলেছে—এত ভাবো কেন তুমি বাহার? যে যা চায়, যেমন করে চায়, তাই কি পায়? তেমনি করে পায়?—খুব ক্লান্ত মনে হয়েছে আনন্দের কণ্ঠ।

—সান্ত্বনা দিচ্ছ আনন্দ?

—না, বাহার।

—আচ্ছা আনন্দ, কোনদিন যদি দূরে চলে যাও, তাহলে মনে রাখবে আমায়? এই দিনগুলো মনে পড়বে?···আমি কিন্তু ভাবতে পারি না···অথচ দেখ, তখনও সকাল হবে, সন্ধ্যা হবে···দিন এমনই চলবে।

—একটা গান শুনবে বাহার?

—গাও, আনন্দ।

—কথাটা শোনো·· বুঝতে পারবে—

'মনে রেখো সখা এ সুখের দিন
ভুলিয়া যাবে কি সবই?
যদি নাহি থাকি সাথে বাসর জাগাতে
তবু জ্বালিবে প্রদীপ সে সুখ-নিশীথে
প্রভাতে হাসিবে রবি—
ভুলিয়া যাবে কি সবই?'

—এ কি গান আনন্দ?

—অনেকদিন আগে···এ গান নয়, বাহার···

—কি হল আনন্দ ?

—কিছু নয়।··· উঠে বসেছে আনন্দ। হেসে বলেছে—বাহার, অনেকদিন আগে একজনের অনুরোধে এই গানটা গেয়েছিলাম। তখন ভেবেছিলাম তাকে আর ভুলতে পারব না। কিন্তু ছাখো, কেমন চমৎকার ভুলে গিয়েছি। আনন্দ করি, ফুর্তি করি···কই, সেরকম উদাস-করা দুঃখ তো আর হয় না ?

—এ কথা আজ কেন বলছ আনন্দ ?

বাহার কাঁদছে জেনেও মিছে আশ্বাসের কথা বলে পরিবেশকে লঘু করেনি আনন্দ। আদর করেছে, ভালবেসেছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে—হাজারটা দোষ-ত্রুটি মিলিয়ে রক্তমাংসের মানুষ আমি। আমার কি এমন কথা দেওয়া উচিত, যা রাখতে পারবার ভরসা আমি দিতে পারব না ? আমি ঠকাতে পারব না বাহার···না তোমাকে, না আমাকে। তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করেছে বাহার। যা মেলে তা-ই ভালো।

এ কথা মোহনও বার বার বলেছে তাকে। বলেছে—বাহার, যত জনকে তুমি আমি জানি, ও সে-জাতের মানুষ নয়। ও লোকটা জাতে ফকির। ওকে বাঁধতে চাইলেই ছেড়ে যাবে।

—আর ছাড়তে চাইলেই আপনি ধরা দেবে ?

সে কথার জবাব দিতে পারেনি মোহন। আনন্দকে সে চেনে না, অথচ মোহন চেনে, এ কথাটাও ভালো লাগেনি বাহারের। তাই সে বলেছে—আমি যেমন জানি, তেমন করেই ওকে বাঁধব। ছাড়তে পারব না।

—একটু ছাড়লে বোধ হয় ভালো করে বাঁধন জড়াত, বাহারবাঈ।

—মোহন···

—আনন্দ নয়, তোমার কথাও আমি ভাবি···তাই মাঝে মাঝে বেয়াদবি করে ফেলি, বাঈ।

—রাগ করলে ?

—না, বাহার। আমি কখনো তোমার ওপর রাগ করতে পারি ? তোমাকে আমি চিনি না ? জানি বলেই এত কথা বলি। তোমাকে দুঃখ পেতে দেখলে আমার ভালো লাগে না।

—দুঃখ ? আমি দুঃখী ?

এত জোরে প্রতিবাদ করেছে বাহার যে, সস্নেহ সমবেদনায় চেয়ে থেকেছে মোহন। কথা প্রত্যাহার করে বলেছে—না বাহার, আমারই ভুল।

কিছুদিন চলেছে তাদের তিনজনের চমৎকার মিলে মিশে। পদ, সুর ও তালের ভারসাম্য ও মিশ্রণে সার্থক একটা গানের মতো। প্রচেষ্টার সার্থকতার উপলব্ধিতে বিজয়িনীর মতো গর্ব অনুভব করেছে বাহার। ছাখো আমি পারলাম, এই কথাই যেন মোহনকে বুঝতে দিয়েছে সে। আনন্দও মেনে নিয়েছে তার হাজারটা অনুশাসন।

সুখের ভরসায় বুক বেঁধে বাহার কানা হয়ে গিয়েছে ভোমরার মতো। এদিকে হঠাৎ আনন্দ সমস্ত ছবিখানার ওপর কালি ঢেলে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। উধাও হয়ে গিয়েছে তিন-চারদিনের মতো। গোড়ে-মালা শুকিয়ে উঠেছে আয়নার পাশের দেয়ালে। মান-সরমের বালাই ভুলে মোহনের কাছেই অনুনয় করেছে বাহার। বাহারের চোখে আহত দৃষ্টি দেখে অবাক হয়েছে মোহন। এমন হবে তা তো জানা-ই ছিল। তবু বাহার নতুন করে এত ব্যথা পায় কেন ? তারপর সে-ই চলে গিয়েছে। বাঁকালাল পাণ্ডার জুয়ার আড্ডা বা দশরথ ছত্রীর ভাঁটিখানা থেকে খুঁজে-পেতে ধরে এনেছে আনন্দকে। কখনো দেখেছে খেলাচ্ছলে জুয়ার চাকতি ধরে একশো-দেড়শো টাকা হেরে বসে আছে আনন্দ। বাহারকে কিছু না জানিয়ে ফিরে এসেছে,

নেকলালকে ডেকে তুলেছে। টাকা নিয়ে গিয়ে খালাস করেছে আনন্দকে বাহার। কখনো কোন চেনা জায়গাতেই হদিশ মেলেনি। সকালবেলা আখ্‌তারীর নাতনী চতুরাণ পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে আনন্দকে। মিঠে গলায় সমবেদনার সুরে জানিয়ে গিয়েছে—আহা, বড় দুর্ভাগ্য বাহারের। এত রূপ-যৌবন, এত করে সে আনন্দের জন্য, তবু আনন্দ সে-ত্যাগের মর্যাদা দেয় না। পুরুষ জাতটাই বেইমান। এই-যে তিন দিন আনন্দ তার ঘরে পড়ে ছিল···

ঘটনার রকম-ফের দিয়ে তাদের জীবনের কাহিনীটা মোটামুটি এই কয়টা অধ্যায় অনুসরণ করেই চলেছে। আবার মানভঞ্জন থেকে শুরু হয়েছে প্রথম অধ্যায়। দিনের পর দিন এই পরিচিত নাটকটারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আজ পাঁচ বছর পরে চরম ক্লান্তি অনুভব করছে বাহার। ভুল, ভুল, হাজারটা বড় ছোট ভুলভ্রান্তি দিয়ে পাঁচ বছর ধরে যে জট রচনা করল বাহার, তাতেই এখন বাঁধা পড়েছে সে। তার হাত থেকেই সে মুক্তি চায়।

সহসা সম্বিৎ ফিরে পেল বাহার। কত কথাই ভাবছে সে। রাত বাজে একটা। ল্যাম্পে তেল নেই, দপ্‌দপ্‌ করছে। সেই থেকে জানালার ধারেই বসে আছে সে ?

মোহন ফিরে এল। তাকে একলা ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল বাহার। মোহন বললো—না বাহার, কোথাও পেলাম না তাকে।

—চতুরাণের ঘর ? ভেলুপুরা ? সব জায়গায় দেখেছ ?

—হ্যাঁ, বাহার। তবে একটা কথা।

—কি ?

—কাল গিয়েছিল বিনায়কজীর মহালে। গণেশ-চতুর্থীর জলসায়। সেখানে···

—সেখানে কি ?

—সেখানে কালকের জলসায় ওকে ডাকেনি। তবু কাল নেশা

ক'রে ওখানে গিয়ে উপস্থিত। গণেশজী নিজে ছিলেন বলে কেউ কিছু বলেনি ওকে। তবু মির্জাকে তুমি জানো। মির্জার এখন নামডাক হয়েছে। তা ছাড়া তাকে আনানো হয়েছে আগ্রা থেকে। খানিকটা পায়াভারী হয়েছে বইকি। সে-ই বুঝি কি বলেছিল। তাতে আসরে দাঁড়িয়ে আনন্দ হৈ-হল্লা করেছে। বলেছে তোমার নাম···বাহারকে কেন ডাকা হয়নি? আর সে নিজে উপস্থিত থাকতে বেনারসে বসে বিনায়কজী তাকেই অপমান করে উপেক্ষা করেন কোন্ সাহসে?

উত্তেজনায় রক্ত উঠে আসে বাহারের মুখে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে—

—তার পর?

—তারপব যা করেছে সেটাই চূড়ান্ত। গণেশজীর বারণ না মেনে বিনায়কজী বেরিয়ে যেতে বলেন আনন্দকে। বলেন—জমীর খাঁ সাহেবের কথা স্মরণ করে অনেকবার ক্ষমা করা হয়েছে আনন্দের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার। মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে আনন্দ। একেই দু'দিন ধরে হয়তো কিছু খায়নি, স্রেফ নেশা করেছে,—তাতে এই অপমান—ক্ষেপে গিয়ে আনন্দ যা মনে আসে তাই বলেছে। বলেছে, যেখানে টাকার চাক্‌চিক আর বাইরের ঠাটটাই সব, গাওয়াইয়াদের যারা কেনা গোলাম মনে করে, আজ ডাকে, কাল তাড়িয়ে দেয়, তাদের ও ঘৃণা করে। নইলে এখানে বাহারের ডাক পড়েনি কেন? এইসব কথা বলেই সে বেরিয়ে গিয়েছে।

মোহন বললো—বাহার, আমার একটা কথা। হয়তো কালকেই আসবে আনন্দ। কথা দাও, তুমি ওকে কিছু বলবে না। তোমার কাছে ফিরতেই ভয় পাবে। তাই বলছি···

—তাকে একবার ডেকে আনতে পার?

ক্লান্তি, উত্তেজনা ও আবেগে পর্দায় পর্দায় উঠতে লাগল বাহারের গলা—ডেকে আনো তাকে, সে আমাকে মুক্তি দিয়ে যাক—এই বেনারসে আমার নাম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে সবাই? বলবে, আমি

এমন কমজোরী হয়ে গিয়েছি, যে একটা মাতাল আমার নাম জানিয়ে বেড়াচ্ছে আসরে ?

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল বাহার। তাকে সান্ত্বনা দিল মোহন। সমবেদনার স্পর্শ পেয়ে বাঁধ ভেঙে গেল ধৈর্যের। কেঁদে বড় আনন্দ পেল বাহার। কান্নাতে এত আরাম আছে কে জানত !

ঠিক এই সময়ই ঘা পড়ল দরজায়। বিপন্ন কণ্ঠে কে ডাকছে—সাব ! সাব !

ত্রস্তে সরে দাঁড়াল বাহার। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো—কে ? কি বলছ ?

—মোহন-সাবকে পাঠিয়ে দিন, বাঈ। ওস্তাদ বোখার হয়ে পড়ে আছেন, নিয়ে আসতে হবে।

—কোথায় ?

—কেদারঘাটে ··

কথা শুনতে-শুনতেই মোহন ডাক দিল—কাল্লু···কাল্লু···কামিজ পবে নাও তো ভাই !

উৎকণ্ঠিত বাহার বললো—টাকা ? টাকা নেবে না মোহন ?

বাহারের উৎকণ্ঠা দেখে মোহনের মুখে আবার সেই আধা বিদ্রূপের মুখোশটা নামল। বললো—মাঝরাতে বেনাবসের রাস্তায় টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছ বাহার ?

নিজেকে ধিক্কাব দিল বাহার। দরজা বন্ধ ক'রে ওপবে এসে বসলো।

কেদারঘাটে ভিখিরীগুলোর পাশে তাসের জুয়াড়ীদের খেলবার সতরঞ্চিটা মুড়ে পড়ে ছিল আনন্দ। জ্বরের ধমকে চোখের পাতায় রংমশালের ফুল্‌কি ছুটছে। মাথার মধ্যে বসে কোন বেতালা তবলচি হাতুড়ি পিটছে। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফের স্রোত

উঠছে আর নামছে। বাহারকে চায় আনন্দ। কিন্তু কোথায় বাহার ?

বিনায়কজীর বাড়ীর হল্লার পর কি হল যেন! প্রথমেই তো ছত্রীর তাড়িখানায় ঢুকে খানিকটা মদ খেল আনন্দ। সেখান থেকে বেরুল রাত বারোটায়।

সেই সময়ই দেখা হয়ে গেল বাঁকালালের সঙ্গে। এমনিতে বাঁকালালের প্রতি আনন্দের একটা ঘৃণার ভাব আছে। এলাচি খেলিয়ে কতজনের সর্বনাশ করেছে ও, সে কথা বাহারের মুখে অনেকবার শুনেছে আনন্দ। উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিজের চোখে একটি অনভিজ্ঞ বিহারী জমিদারের ছেলেকে দেউলে হ'তে দেখে বড় খারাপ লেগেছিল। আরো খারাপ লেগেছিল যখন ছেলেটিকে বেহুঁশ ক'রে গঙ্গাপার করে দিল বাঁকা। মনের অবস্থা খুব খাবাপ না হলে বাঁকার সঙ্গে যেত না আনন্দ। কিন্তু নিজের বাড়ীতে আসব দিচ্ছে বাঁকা। আনন্দকে ধবে নিয়ে গেল সে, কিছুতেই ছাড়ল না। বললো—ওস্তাদ, আপনাকে পেয়ে যাব, এ কথা তো ভাবিনি। চলুন জনাব, মাথায় ক'রে নিয়ে যাব আপনাকে।

খুব নেশার চোখ। সেইজন্যেই জমায়েতের দিকে চোখ পড়েনি আনন্দের। বেনারসের সঙ্গীত-সমাজের অন্যতম বিখ্যাত তরুণ গাওয়াইয়া আনন্দ তাদের মধ্যে এসে বসেছে, তাতেই ধন্য বোধ করল জমায়েৎ। বোতল খুলে ধরল স্বয়ং বাঁকালাল। খাবার এল রুপোর থালায়। এই আদর যত্ন খুব ভালো লাগল আনন্দের। বাঁকালালকে একজন সমঝদার লোক বলে মনে হল।

গান সমাপন হ'তে হ'তে ভোর হয়ে গেল। গানের শ্রোতা হচ্ছে কয়জন ভাড়াটে বাঈজী, কয়জন কুখ্যাত গুণ্ডা আর তাদের পৃষ্ঠপোষক পাঁচ-সাতজন শেঠ মহাজন, এ সব খেয়াল না করেই ভোরাই সুরের ঠুংরীতে মনের সব দুঃখ ঢেলে দিল আনন্দ। 'যমুনা-কী তীর' গাইতে

গিয়ে নিজের চোখেই জল ভরে এল। অবিমিশ্র আনন্দের অনুভূতিতে মনটা ভরে উঠল তার। গান গেয়ে এত সুখ আছে জেনেও কেন বার বার ভুলে যায় সে? বড় পবিত্র হয়ে গেল তাব মনটা।

শ্রোতারাও মুগ্ধ হল। রেশমের লম্বা একটা থলি আনন্দের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল বাঁকালাল। বললো—আমাদের আসরে কোনদিন তোমাদের আনতে পারি না ওস্তাদ—ভরসা হয় না বলতে। আজ থেকে আমাব জুযার আড্ডায় তুমি এসো না, ওস্তাদ। ভগবান তোমাকে রাজা করে পাঠিয়েছেন। এত সম্পদ আছে তোমাব! আমার আড্ডা আর দশরথের ভাঁটিখানায় ঘুবে ঘুবে সময় নষ্ট করবে কেন?

রাস্তায় এগিয়ে দিতে দিতে বললো—যেদিন টাকার দরকার হবে, শুধু খত্ ভেজে দিয়ো, আমি টাকা পোঁছে দিয়ে আসব তোমার ঘবে।

টাকাব জন্যে যে-বাঁকালাল কোন কাজেই হাত দিতে ঘেন্না করে না, বাতভোব মাইফেলেব পব সে-ই টাকাব বিষয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'বে কথা বলে, এটা খুব আশ্চর্য লাগল আনন্দের। তারপরে ঘবে ফিরবাব কথা মনে হ'তেই ভয় ঢুকল মনে। সারা রাত জুয়াড়ীর আড্ডায় বসে গান গেয়ে ভোববেলা ফিবলে, বাহার কি ক্ষমা করবে তাকে? বিনায়কজীর বাড়ীর কথাবার্তা কি তাব কানে পৌঁছয়নি? ছি ছি, সে কি ভীরু? নিজেকে তিবস্কার করল আনন্দ। সাহস পাচ্ছে না কেন? মাথাটা দপ্‌দপ্ করছে, শবীবটা জ্বলে যাচ্ছে। জ্বর আসছে, সেটা না বুঝেই বাহারকে গালি দিতে লাগল আনন্দ। এ-ই তো করেছে বাহার। জাগতিক মানদণ্ডে মানসম্মান কষে কষে তাকে খতম করে দিয়েছে। তার ফলেই না আজ তার এই অবস্থা? এখন ঘরে ফিরলে নির্ঘাত পঞ্চাশটা জবাবদিহি করতে হবে। কে ঘরে যায়? একলা একলা বকবক করতে করতে চললো আনন্দ। কেন, তার কি আর যাবার জায়গা নেই? চোদ্দটা বছর কাশীতে কাটিয়ে

গিয়েছে সে। ডেরা তার জানা আছে। যারা তাকে চেনে তারা সবিস্ময়ে চেয়ে রইল।

ঘাটের পাশে ক'টা কুঠরি। এখানে যে বোবা সন্ন্যাসীটা থাকে তাকে জানে আনন্দ। কাজে-কাজেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। স্নান সেরে ফিরে এসে তাকে দেখে সন্ন্যাসী গায়ে পিঠে হাত দিয়ে দেখল। জুয়াড়ীদের তাস খেলবার সতরঞ্চিটা দিয়ে ঢেকে দিল গা। মুখে জল দিল।

রাতের মুখে জ্বরটা বাড়তে তিন-নম্বর জুয়াড়ীটা খবর দিতে গেল মোহনকে। যত-রাজ্যের বাজে ঝুলঝামেলা! বকবক করতে লাগল তার সঙ্গীরা। টাকা রোজগার করেই কি শান্তি আছে? এই তো একটা গুণী লোক। কোন বাঈজীর যেন ঘরপোষা। তবু ছাখো এখানে এসে লটপট খাচ্ছে। সুখ কোথাও নেই।

জ্বরের মাথায় চটে গেল আনন্দ। বকবক শুরু করল। মোহন যখন এসে পৌঁছল, তখন আনন্দ চ্যাঁচাচ্ছে—আ যা, আ-যারে!

—কাকে ডাকছ আনন্দ?

মোহনকে দেখে গালি দিল আনন্দ। বললো—সুখকে ডাকছি। সুখ কোথায় ধরতে গেলাম, তা ছাখো, কলকাতা থেকে কাশী, ভেলুপুরা থেকে কেদার, তাড়া করেই বেড়াচ্ছি। আমি বলছি ধরতে পারছি না, তা কি বাহার শোনে? সুখ ধরতেই হবে। সুখের নাগাল কি করে আমি পাব?

—আনন্দ! কি বকছ? আমি মোহন।

—তুমি সব জায়গায় ধাওয়া করে বেড়াচ্ছ? কেন ধরে নিয়ে যাবে? আমি যাব না।

—বাহার বসে আছে আনন্দ।

বাহারের নাম শুনতে চুপ করল আনন্দ। তাকে ধরে নিয়ে গাড়ীতে তুললো মোহন আর কাল্লু।

ধুলোমাখা জামাকাপড়, লাল চোখ, জ্বরের ঘোরে লাল মুখ—আনন্দকে দেখেই ছুটে এল বাহার। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় জল ঢাললো। ডাক্তার আনতে বেরিয়ে গেল মোহন। পাশে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, পকেট থেকে টাকার থলিটা গড়িয়ে পড়তে দেখে তুলে নিল বাহার। অনেক টাকা। কোথা থেকে পেল? আর পকেটে এত টাকা থাকতে যে-মানুষ পথে ঘাটে অসহায় হয়ে পড়ে থাকে, তার ওপর রাগই বা করে সে কেমন করে?

—বাহার!

—এই তো আমি আনন্দ।

—চলে যেয়োনা বাহার।

—না।

পরম নির্ভরতায় তার হাতখানা ধরে চোখ বুজল আনন্দ।

সেবা করবার সুযোগ পেয়ে যেন নতুন করে নিজেকেই খুঁজে পেল বাহার। তার সম্মান রাখতে গিয়েই আনন্দ অসম্মান বরণ করেছে সেদিন, এই কথাটা বার বার মনে হল তার। অনেক কথাই ভুলে গেল বাহার। ক্ষমা এল মনে। হৃদয়ে সঞ্চারিত হল মমতা ও প্রেম। বড় মধুময় মনে হল জীবন। আনন্দ একবার না ডাকতে ছুটে আসে বাহার। রাত জেগে বাতাস করে। ছোট একটা চৌকা ধরিয়ে নিজে তৈরি করে পথ্য। পরিষ্কার চাদর বদলে নতুন চাদর পাতে বিছানায়। ধূপ জ্বেলে সুগন্ধি করে ঘর। দেখে অবাক মানে আনন্দ।

ওদিকে পুঁজিতে টান পড়ে। বিনায়কজীর বাড়ীর সেই জলসায় কতখানি ক্ষতি হয়েছে তার, সে খবরও রাখে না বাহার। তবে হোলির মরসুম শুরু হবে। এই সময়ই গত বছর অবধি আসরে হাজিরা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বাহার। গান গায় অনেকেই। কিন্তু যারা পয়সা দিয়ে আসর লাগায় তারা যে সকলেই সঙ্গীত-রসিক, তা নয়। অনেকেই প্রচলিত হালকা কয়টা ঠুংরী-গজলের বেশী কিছু

চায় না। বাঈজী যদি তরুণী ও সুন্দরী হয়, আবীর-গুলালে রঙীন ফরাসে দাঁড়িয়ে যদি নাচে, আর দেয়ালের বড় বড় আয়নায় তার ছায়া পড়ে—তাতেই তারা খুব খুশী। রেষারেষি ক'রে বাহারকে মোটা টাকা কবুল করে নিয়ে গিয়েছে তারা গতবার। কতকগুলো বেরসিক বানিয়া আর পাণ্ডার বাড়ীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার জন্য কত রাগ করেছে আনন্দ। কিন্তু বাহার তা মানেনি। টাকার দরকার তার। বাঈজী হয়ে এইসব আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করলে তার চলে না। কাশীতে বাস করে এদের চটানোও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তা ছাড়া কবে ভালো আসর পাব, তবে গান গাইব—এ আশায় বসে থেকে কি হবে? আনন্দের খুশ-খেয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কতকগুলো বাঁধা ঘর তো ইতিমধ্যেই হারিয়েছে বাহার।

বাহারের ওপর রাগ করেছে আনন্দ। দিনান্তে কিন্তু পঞ্চাশ, একশো, দু'শো টাকা নিয়ে ফিরেছে বাহার। বাহারবাঈকে পেলে কে চতুরাণ, সুহাগণ আর ছোটিকে চায়? সকলেই ডেকেছে বাহারকে, আর সেই ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে তার নামে কত কথাই বলেছে অন্যরা।

বিনায়কজীর বাড়ীর ঘটনাটার জের এখনও মানুষ মনে রেখেছে কিনা কে জানে? সাত-পাঁচ ভেবে সন্ধ্যাবেলা প্রসাধন করতে বসল বাহার। সাদা শাড়ী প'রে গুণ্ঠন টেনে দিল মাথায়। পানের বাটা নিয়ে এল সুরতিয়া। গাড়ী ডাকতে গেল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বাহারকে দেখে আনন্দ বললো—কোথায় যাচ্ছ বাহার?

—কোথায় আবার? কত কি সওদা করবার আছে, কতদিন বাইরে যাই না, তাই যাচ্ছি।

—গণেশজীর ওখানে যাচ্ছ বাহার?

ধরা পড়ে অপ্রতিভ হয়েই চট করে সামলে নিল বাহার। বললো—পাগল!

—পাগল একজনই থাকুক, বাহার। তুমি যেন যেয়ো না। তোমার অপমান হলে আমি সহ্য করবো না জান তো ?

সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটু হাসল বাহার। বললো—তোমার কথাটা খুব ভালো লাগল আনন্দ।

—ওটা জবাব হল না বাহার।

—জবাব দেব ঘুরে এসে। তবে হ্যাঁ, অন্যায় কিছু করব না আনন্দ, এ-ও জেন।

আনন্দ তা জানে। তার চোখে ফুটল অনিচ্ছুক শ্রদ্ধা। বললো —যা ঠিক মনে করবে তাই কোরো বাহার।

গাড়ী এসে দাঁড়াল। বাহার একলা গিয়ে উঠল গাড়ীতে।

গণেশজীর বাড়ীতে ঢুকতেই ভয় পাচ্ছিল বাহার। অনেক করে সাহস সঞ্চয় করে ঢুকল।

বাগানে ইজিচেয়ারে শুয়ে ফরসি টানছিলেন গণেশজী। হাত দেখিয়ে মোড়ায় বসতে বললেন বাহারকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল। তারপর মাফ চেয়ে কথা শুরু করল বাহার। হাতের ঝাপট মেরে থামিয়ে দিলেন গণেশজী। বললেন—আমি যা বলি শোনো, বাহারবাঈ। তুমি জান, আনন্দের জন্যে আমি কি করেছি আর কি করিনি। জমীর খাঁ সাহেব, ভগবান তাঁকে শান্তিতে রাখুন, তাঁরই প্রিয়শিষ্য আনন্দ। সম্মান সে অনেক পেয়েছে। টাকাও কামাই করেছে। অনেকের চেয়ে সে ভাগ্যবান সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় দুঃখের কথা যে, নিজের ভালো সে বোঝে না। নিজের বন্ধুদের সে চিনতে পারে না। তাই এত হেলাফেলা ক'রে নিজের ভবিষ্যৎ ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে সে। নইলে মাতাল, জুয়াড়ী আর পাণ্ডাদের আড্ডায় পড়ে থাকে, জামা-কাপড়ের ঠিক-ঠিকানা নেই, চেহারা উদাস, দিমাক ঠিক নেই, এ রকম দশা তার তো হওয়ার কথা নয়। নরসী-প্রসাদের কাছে তার ঋণ কতখানি বলো—অথচ তারই ভাতিজা এল

সেবার, আনন্দ কথা দিয়েও জলসায় এল না একবার—রামনগরে গিয়ে ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে ফুর্তি করল তিন দিন। বলো, কি করতে পারে মানুষ।

বাহার অশ্রু মার্জনা করল আঁচলে। অনেকগুলো কথা বলে গণেশজী জোরে ফরসি টানতে লাগলেন। বাহার বললো—আমি চলি আজ। আমার গোস্তাকি মাফ করবেন—আগে আসতে পারিনি।

এতক্ষণে ভ্রূকুটি সরে গিয়ে সরল হল গণেশজীর দৃষ্টি। সদয় কণ্ঠে বললেন—বে-ফয়দা নেশা-ভাঙ ক'রে জোয়ান বয়সে নিজের নসীব খারাপ করে কেউ? আর তুমিই বা কি করছ? তুমিও তো আসাযাওয়া রাখতে পার। দেখলে শুনলে আমরাও খোঁজ-খবরদারি করতে পারি।

—'আপনি দয়াবান। মহৎ আপনার অন্তঃকরণ'—বাহারের কণ্ঠে কিছুটা যেন নতুন ভাব জাহির হল। প্রবীণ গণেশজীকে অবমাননা করল না বাহার, কিন্তু বুঝতে দিল যে, সে কোনদিনই তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকবে না। মুখে বললো—তা ছাড়া আপনাদের হাজার রকম কাজ আছে, ঝামেলা আছে, আমাদের কথাবার্তা নিয়ে হাজির হলে হয়তো বিরক্তই করা হবে, না কি বলুন?

গাড়ীতে বসে চতুরাণের ঘরের ঠিকানা দিল বাহার। গণেশজীর কথাবার্তায় মনে হল সমাজে একটা বিপরীত মতামত গড়ে উঠেছে তাদের নিয়ে। আনন্দ নয়, তাকে লক্ষ্য করেই যেন আঘাতটা আসবে। আনন্দকে রাখতে গিয়ে বাহার যেমন উপেক্ষা করেছে নিন্দা-প্রশংসা, নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছে—তারই পালটা জবাব পাচ্ছে আজ। আনন্দের প্রতিভাকে লাগাম পরাতে চেয়েই কি ভুল করেছে বাহার? তাই বল্‌গা ছিঁড়ে আনন্দ বেপরোয়া পরিণতির দিকেই চলেছে? তাহলে কি হেরে গেল বাহার?

কখনো নয়। গাড়ীর জানালাটা ফরসা হাতে চেপে ধরল বাহার। গাড়ীর আয়নায় উঠছে-নামছে তার ছায়া। সে এখনো সেই বাহার, যার হাসিতে বিজুবী খেলে, অনভিজ্ঞ তরুণ শ্রোতারা যার একরাতের জলসার দাম দিতে সর্বস্ব ঢেলে দিতে চায়, বেনারসের বেনারসী যার নাম। হেরে যেতে পারে না সে। জিততে তাকে হবেই।

ফরাসে কাত হয়ে শুয়ে আলবোলা টানছিল চতুরাণ। বাহারকে দেখে অভ্যর্থনা জানাল সাদরে—আয় আয়·· এত দিনে মনে পড়ল? আসবার সময় হল?

দুই হাতে আটটা আংটি ঝলমল করছে। ঝকঝকে রুপোর বাটা এগিয়ে দিল চতুরাণ। বললো—বাহার, তোর তো খুব পছন্দ আছে, দ্যাখ্ তো কি রকম? গহনার একটা বাক্স খুলে ধরল চতুরাণ।

বাহার বললো—ভালো।

—ভালো হলেই ভালো। ভোগীলাল পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি বলি, এসব কি আর আমাদের মানায়? আমরা পুরোনো হয়ে গিয়েছি, তা মানতে চায় না। বাঙালীদের মতো সোনা পরতে পারি না আমি—তাই পাথর কিনলাম।

—ঠিকই করেছ। কথা খুঁজে পেল না বাহার। দুজনে দুজনকে শিকারীর মতো তাক করে দেখতে লাগল। চতুরাণ বললো—ওস্তাদজীর কি খবর বাহার? খুব বিমার হয়েছিল শুনলাম।

—ভালো আছে।

—তোরই হয়েছে কষ্ট। না না, ছোটটি থেকে দেখছি তো··· কষ্ট পেতে দেখলে বড় দুঃখ হয় বাহার।···যাই বলিস, তোর বড় কষ্ট বাহার।

—'কষ্ট কিসের?' মনের অসন্তুষ্টি মনে চেপে রেখে ঠোঁটে হাসি টানল বাহার। বললো—অসুখ হয় না মানুষের?

সমব্যথীর মমতায় করুণকণ্ঠে চতুরাণ বললো—তোর কি তুলনা আছে বাহার? তাই তো বলি, যখন রাতের পর রাত এখানে পড়ে থাকতেন ওস্তাদ···আমি কত বলেছি, ঘরে চলে যান। বসে আছে বাহার। তা কি মেনেছেন? একবার তো নয়, কত বার হয়েছে।

—শেষ কবে এসেছিল ও?

—এক মাস হবে। বিনায়কজীর বাড়ীর হল্লাগুল্লার আগেই হবে। সে যা কেচ্ছা হয়ে গেল···

বাহার বললো—চতুরাণ, যে কথা আমরা দুজনই জানি, সে কথা থাক। খবরাখবর বলো। হালচাল কি রকম?

—এখন তো বড় কাজের সময় বাহার—হোলিতে এবার জয়পুর থেকে হোলি-নাচ আনাচ্ছে ভোগীলাল। বাপ মরতে যত টাকা পেয়েছে, সবই ঢেলে দিচ্ছে ছেলেটা। তার বাড়ীর জলসা-ই হবে দেখবার মতন। তুই তো যাচ্ছিস্ বাহার?

মাথা নাড়ল বাহার। বললো—আমাকে তো ডাকেনি। আর কেন ডাকেনি সে-কথা শুনতেই আমি এসেছি চতুরাণ। বলো, কি খেলা চলেছে।

—কি খেলা বাহার? আমি তো তোর কথা-ই বুঝছি না।

—আমি খুব বুঝছি। কিন্তু এ-ও জানি যে, নিজে সাঁচ্চা থাকলে তবেই দুনিয়া সাঁচ্চা থাকে। আমি তো কোন ভুল করিনি চতুরাণ?

আবেগের মাথায় বলে চললো বাহার—এমন কিছু আমি করিনি যা বে-নজীর। এ রকম আমার-তোমার ঘর-ঘরানায় হামেশাই হয়েছে।

—কিন্তু তোর ওস্তাদ তো তা বুঝলেন না বাহার।

—বোঝেনি বলেই তো তার এত কষ্ট।

বাহার দুঃখ পাচ্ছে, অন্তরে তার জ্বালা ধরেছে এই দেখেই যথেষ্ট

মানল চতুরাণ। বললো—থাক্ গে ভাই এসব কথা। তুমি এসেছ, তাতেই আমি খুব খুশী। পুরোনো বন্ধু তুমি। দেখে দুঃখ হয়, তাই দুটো-একটা কথা না বলে পারি না।

—ঠিক আছে চতুরাণ। যার মুখ আছে সে বলবেই·· তাই বলে সব কথা যে শুনতে হবে তার কোন মানে আছে ?

—কি কথার কি জবাব দাও বাহার—বড় ভুল বোঝ তুমি।

—ভুল বুঝি আর ভুল করি। তাই না চতুরাণ ? কিন্তু যে যাই বলুক, আমি কিছুতে মানতে পারি না আমার ভুল হয়েছিল।

উঠে দাঁড়াল বাহার। বললো—ঘুরতে ফিরতে এমনিই এসেছিলাম—কোন ফিকির নিয়ে আসিনি চতুরাণ। দেখা হল তো ভালো হল। আজ চলি, ভাই।

উঠে দাঁড়াল চতুরাণ। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন মনে পড়ল কথাটা এমনি মুখ করে বললো—রোহাত্গী বেনারসে এসেছে জান কি ?

—বুড়ো রোহাত্গী ?

—না না, বুড়ো তো গত সালে মারা গেছেন বাহার। কুন্দলাল এখন মালিক।

—'তাই বু'ঝি ?' ব'লে বিদায় নিল বাহার।

আপনি-আপনিই অধর দংশন করল চতুরাণ। অহঙ্কার ম'রেও মরেনি মেয়েটার। হ্যাঁ, উঠেছিলি বটে একদিন। সে কি গুণপনার জন্যে ? পুঁজি ছিল চেহারা, আর ঠেলে তোলবার লোক ছিল বলে। প্রেম ক'রে তো ফেঁসে গেলি। প্রেম করলি যার সঙ্গে, তাকে ক'টা বোতলের প্রতিশ্রুতি দিলেই ব'সে যায় যেখানে সেখানে, তোর নামে দশটা গালি দিয়ে কথা বলে, গান গায় জুয়াড়ী মহল্লায়। তবু তোর এত দেমাক ? বড় আয়নার সামনে পাথরের চৌকিতে বসল চতুরাণ। ঈষৎ স্থুল হয়েছে দেহ। তবু যৌবন আছে। গৌর মুখের মেচেতার

দাগে সর-বেসমের গোলা লাগাতে লাগতে বাহারের ওপর রাগে পান-জর্দার পিচ ফেললো পিকদানিতে। বোকা ঝি-টাকে ধমক দিয়ে বললো—আরে, এ ছোক্‌রী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখে? তামাসা? যা, জল নিয়ে আয়।

ঘোড়ার গাড়ীর গায়ে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগল বাহার। কি তাড়াতাড়িই যে কেটে গিয়েছে গত পাঁচটা বছর—দুনিয়া-ছাড়া জীবন কাটিয়েছে বাহার। কোন খবরই রাখেনি। রোহাত্‌গীদের ছেলে কুন্দলাল আজ মালিক হয়েছে বিশাল রোহাত্‌গী এস্টেটের। গাঁজা-তামাকের চাষের পয়সায় অর্জিত যে সম্পত্তি, তা যে মদ ও স্ত্রীলোকের পেছনেই খরচ হবে সে-নিয়ম অবধারিত। তাই ছয় বছর আগে বাহারকে নিয়ে যখন ছোকরা কুন্দলাল ক্ষেপে উঠেছিল, সকলেই বুঝেছিল—হ্যাঁ, বাহার বড় গাছেই নৌকো বাঁধল এবার।

বড়লোকের ছেলে। জীবন যৌবন ধন মান সবই বাহারবাঈয়ের পায়ে সঁপে দিতে প্রস্তুত ছিল কুন্দলাল। কিন্তু চালে তার ভুল ছিল। বাহারের কাছে সে বিবাহিতা স্ত্রীর বিশ্বস্ততা আশা করতো। আর কোথাও যেতে পাবে না বাহার, গাইতে পাবে না—এসব অনুশাসন মানা অসহ্য বাহারের পক্ষে। স্বাধীন জীবনের স্বাদে বড় নেশা লেগেছে তার। কুন্দলাল বলেছিল—টাকা চাও বাহার, যত খুশী টাকা নাও তুমি। কিন্তু বার বার নিষ্ঠুর হও কেন? আমাকে তুমি ভালবাস না?

—আপনি দেন, আমি নিই। আমার পক্ষে আপনাকে কতটা ভালবাসা সম্ভব বাবু? আর ঘরের জরুর ভালবাসাই যদি চান, তো আর একটা সাদী করে নিন। আমি তো আপনার তিন-নম্বর বৌ হ'তে পারব না।

তখন দুঃখ করেছিল কুন্দলাল। বলেছিল—কাঁইয়া মানুষ,

বানিয়াগিরি বুঝি। আমাকে কেন তুমি ভালবাসবে বাহার? আমারই ভুল হয়েছিল।

আজ সেই কুন্দলাল লাখ-লাখ টাকার মালিক। যে বাহার তার অধীন হতে চায়নি বলে তেজ করে চলে এসেছিল, সে এসে শিকলি পরল এক সৃষ্টিছাড়া মানুষের কাছে। তার যুক্তি তার কাছেই থাকুক। দুনিয়ার মানুষের চোখে তো এটাই ঠেকবে যে, হিসেবে ভুল করেছে বাহার। অধীনতা স্বীকার করতেই যদি হয়, তো সেই মানুষ ধরা উচিত ছিল, যে রজতমূল্যে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারতো।

অতি দুঃখে হাসি পেল বাহাবের। দুনিয়াব কথা বাহার ভাবে না। কিন্তু আনন্দ যদি তার দুঃখ তাব মতো করে বুঝতো!

সে ফিরবে বলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে ছিল আনন্দ। মলিন মুখে ফিরল বাহার। কথা না বলেই ঘবে চলে গেল।

ঘরে ঢুকল আনন্দ। খাটে বসে বাইরের দিকে মুখ করে বসে আছে বাহার। আলোটা নেভানো। পথের গ্যাসের আলো একটু এসে পড়েছে। আনন্দ পাশে এসে বসল। সস্নেহে বললো—কি হয়েছে বাহার?

—কিছু না তো।

—'তুমি কাঁদছ বাহার?' গভীর মমতায় বাহারকে কাছে টেনে নিল আনন্দ। চুপ করে মাথা রেখে বসে রইল বাহাব। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আনন্দ বললো—গণেশজী কিছু বলেছেন?

মাথা না তুলেই বাহার বললো—না। কেউ কিছু বলেনি।

—তবে কি হল? কে কি বললো? বলো, কেন এমন মুখ করে ঘরে এলে বাহার?

আনন্দের কণ্ঠের গভীর মমতায় বাহারের অনেক দুঃখ যেন জুড়িয়ে গেল। ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। আনন্দ

তার মুখ তুলে ধরল। আলো-আঁধারিতে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে বাহারকে। মাথা উঁচু করে চ'লে ফিরে বেড়ায় যে মেয়ে, রুক্ষসূক্ষ যার বাইরেটা, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় বলে হাজারটা বড় ছোট ঝড়-ঝাপ্টাই যার ওপর এসে পড়ে, সে মুখ মলিন করে ঘরে ফিরে কোণে বসে কাঁদছে দেখে বড় কষ্ট হল তার। অতর্কিতে নিষ্ঠুর ঘা পেলে শিশুর মুখ যেমন অসহায় দেখায়, তেমনিই দেখাচ্ছে বাহারকে। আনন্দ বললো—তোকে বড় দুঃখ দিলাম বাহার···আমার পাপের ক্ষমা নেই।

তুই বলে ডাকতো আনন্দ প্রথম দিকের দিনগুলোতে। সেই কথা মনে পড়তে সুখ-দুঃখের মিশ্র অনুভূতি আবার অশ্রু হয়ে নামল। বাহার বললো—কই আনন্দ, কোন দুঃখ তো নেই আমার।

—সত্যি ?

—সত্যি।

অনেকদিন পরে দুজনে খানিকটা কাছে এসেছে। মুহূর্তগুলোকে নষ্ট করতে চাইল না কেউ-ই। চুপ করে বসে রইল একই ভাবে। যেন এর পরেও কোন কথা কইলে মুহূর্তের মায়াটুকু কেটে যাবে।

কিছুক্ষণ বাদে আনন্দ বললো—চলো বাহার, কোথাও ঘুরে আসি।

সেই কথাতেই আবার বাস্তব চেতনা ফিরে এল বাহারের। উঠে বসে বললো—যাব। হোলির পরে।

—হোলির সঙ্গে আমাদের কি হিসাব বাহার ?

—হোলিতে-ই তো বেনারসে ধুম লাগে আনন্দ। মনে নেই কত কত টাকা ঘরে এনেছি আগে ?

আবার টাকার প্রশ্ন। রূঢ় কশাঘাতে বাস্তবে ফিরে এল আনন্দ। নিরীক্ষণ করে বাহারকে দেখল। বাহার করুণ হেসে বললো—টাকার কথা তুললাম বলে আমাকে ছোট ভেব না আনন্দ।

—ছি-ছি-ছি··· আত্মধিক্কারে আনন্দ মাথা নাড়ল,—অতই কি নেমে গিয়েছি বাহার ?

তার পর সে-ও হাসল। বললো—নিশ্চয় টাকার দবকার। কিন্তু কি করে কি হবে বাহার ?

—সব করছি আমি। শুধু তুমি দেখ, আনন্দ। হাঁটু ভেঙে বসল বাহার। উৎসুক চোখ তুলে ধরে বললো—যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ লড়ব আনন্দ। মরে তো যাইনি।

—'বলছো!' আনন্দের কণ্ঠেব করুণ সুরটা হাবিয়ে গেল বাহারের উৎসাহিত সঙ্কল্পেব জোয়ারে। বাহাব বললো—সব করবো আমি। আমার পাশে তুমি রয়েছ আমার ভাবনা কি বলো? হার আমি স্বীকার করতে পারব না আনন্দ।

হঠাৎ খুব দুর্বল মনে হল নিজেকে আনন্দের। মনে হল এতখানি ভবসা করতে চায় বাহাব। কিন্তু তেমন করে লড়বার কোন তাগিদ-ই তার নিজের মধ্যে নেই। ক্ষান্তি এসেছে, নির্লিপ্তি এসেছে। সব ছেড়ে দিয়ে কোথাও চলে যেতে পাবলেই তাব ভালো লাগতো। কিন্তু ছাড়তে চায়না বাহার। জোর কবে মুঠো করে ধরতে চায় ভাগ্যকে। তাকে ভরসা কবে এই টালমাটালের দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিতে চায় বাহার, অথচ নৌকোখানাব ভেতরটায় ঘুণ ধবেছে, ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে। কে জানে কতদূব যাওয়া চলবে। মাঝপথেই হয়তো খতম হয়ে যাবে সফর। মুখে বললো—বেশ তো বাহাব··· যা ভালো হয় করো—মোহনের সঙ্গে পরামর্শ কবো।

শ্রান্ত বোধ করে শুয়ে পড়ল আনন্দ। পাশের ঘরে উৎসাহিত কণ্ঠে মোহনকে নির্দেশ দিচ্ছে বাহার, শুনতে শুনতে মনে হল আজ একটু মদ খেলে বড় ভালো লাগতো তার। চিরন্তন নিঃসঙ্গ একাকীত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার আর কোন উপায় আনন্দ জানে না।

॥ সাত ॥

ফাল্গুনের উত্তাপে গঙ্গার জল টানতে শুরু করেছে সবে। শহর মেতে উঠল রঙের নেশায়। মেয়ে-পুরুষ কাপড় রঙাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। চকে সারি সারি দোকানের সামনে অভ্র-মেশানো আবীর চাদরে ঢেলে দিল দোকানী। গুলাল কুঙ্কুম তৈরির ধুম পড়ে গেল। হোরির সমবেত গান ও নাচে পথঘাট মেতে উঠল।

বাইরে যখন এত রঙের খেলা চলেছে, তার কিছুটা মাতন বাহারের মনে লাগল না কেন ভেবে-ভেবে মন খারাপ করল আনন্দ। কিছু করবার নেই তার। সদ্য রোগমুক্তির পর অবসন্ন দেহমন। বাহারের খবর পেয়ে রোহাত্‌গীদের গাড়ী এসেছে প্রত্যহ। রেশম ও বেনারসীর সঙ্গে গহনার জমক দিয়ে গাড়ীতে উঠেছে বাহার। শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত চরণে যখন ফিরেছে তখন কোনদিন রাত দুটো, কোনদিন একটা। ঘুম ভাঙতে বেলা গড়িয়েছে। ততক্ষণে সারেঙ্গীরা বসে সারেঙ্গীর কান মোচড়াচ্ছে, মোহন হারমোনিয়মের মেজাজ খুশী করবার সাধ্যসাধনায় ব্যস্ত, তবলচি পিতলের হাতুড়ি পিটে আওয়াজ মেলাচ্ছেন, উঠে স্নান করেই আসরে বসেছে বাহার। অভ্যাসের শেষে আহার করতে-না-করতে বেলা গড়িয়ে গেছে। তারপরে বিশ্রাম, প্রসাধন ও প্রস্তুতি হ'তে-না-হ'তে সরু গলিটায় ক্ষুরের শব্দ তুলে মস্ত গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে। আনন্দকে সম্ভাষণ জানিয়ে দ্রুত নেমে গিয়েছে বাহার।

পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অগাধ অর্থ খরচ করবার যে পন্থাগুলো গ্রহণ করেছে কুন্দলাল, তাতে কোন নতুনত্ব নেই। সে পন্থা শুধু পুরোনো নয়, গলিত ও জরাজীর্ণ। টাকা দ্রুত যাবার এমন পন্থা আর নেই। টাকা ফেললে দুনিয়া বশ করা যায় এ সত্য কুন্দলাল জানতো। বাহারকে তার ব্যতিক্রম মনে হয়েছিল। তাই বেনারসওয়ালী বাহার-বাঈয়ের নাম তার মনে ছিল।

'বাহার, বাহার' ক'রে মনে একটা প্রত্যাশা ছিল কুন্দলালের। কিন্তু দেখে মনে একটা ধাক্কা খেল কুন্দলাল। ভেতর থেকে মানুষটার যেন বয়স বেড়ে গিয়েছে। বদলে গিয়েছে বাহার। পাঁচটা বছর ছাপ রেখে গিয়েছে চোখে মুখে। বাইরের চেহারা একই রকম আছে। কিন্তু নিজের মধ্যে থেকেও যেন নেই বাহার। চোখ তার অন্য কথা কয়, হাসলে যেন করুণ দেখায়—কোন ভারকেন্দ্রে যেন টলে গিয়েছে বাহার, জীবনের মূল্যায়ন গিয়েছে বদলে। যৌবনমদগর্বিতা সেই লাস্যময়ী উর্বশী কোথায় গেল? যাকে দেখে বাইশবছরের কুন্দলাল পাগল হয়ে গিয়েছিল? এ বাহারও গান গায়। কিন্তু সে গানের আকর্ষণ অন্যত্র। দুঃখ, বেদনা ও আনন্দের উৎসও কুন্দলালের অজানা। দেখে দেখে কুন্দলাল ঠিক বুঝল, বাহারকে দেখে আর তার নেশা লাগবে না।

শেষ জলসায় সেদিন সকলের অনুরোধে অনেক প্রিয়স্মৃতি-সিঞ্চিত 'য়ো রঙ্গবালে' গাইছিল বাহার। গাইতে গাইতে তার মনের ভেতরটাই হা-হা করে উঠল, কণ্ঠে সঞ্চারিত হল সেই বেদনা। শুনে আসর হায়-হায় ক'রে উঠল।

বিদায় নেবার প্রাক্কালে নদীর ওপর ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটো মনের কথা বলবার লোভ সামলাতে পারল না কুন্দলাল। বললো —পুরোনো পরিচয়। বললে বে-আদবি মনে করবেন না আপনি। একবার গাজিপুর চলুন।

—নিমন্ত্রণ করছেন?

—স্বীকার করলে ধন্য হবো।

—একদিন কিন্তু বাধা ছিল।

—সে পুরোনো কথা। আজ সম্মানিত অতিথির উপযুক্ত সম্বর্ধনা করবার স্বাধীনতা আছে আমার, পরখ করুন। ফরসা, শিথিল পেশীযুক্ত হাতখানা মেলে ধরল কুন্দলাল। নবরত্নের আংটির হীরেখানা জ্বলজ্বল

করে উঠল। দেখে, কৌতুক ও করুণামিশ্রিত হাসি খেলে গেল বাহারের মুখে। ঘননীল বেনারসী শাড়ীর আঁচলখানা মাথায় টেনে দিল ভালো করে। বললো—আজও বাধা আছে, বাবুসাহেব। আমার নিজের দিক থেকেই। টাকার দিক থেকে কোন অমর্যাদা হবে না, সে তো আমি জানি।

—সম্মানের দিক থেকেও নয়।

—আমি আর কাউকে সুখী করতে পারব না, বাবুজী। সে ভুল আমার ভেঙে গিয়েছে।

—বাহারবাঈ!

—আমার-ই দুর্ভাগ্য বাবুজী, হয়তো এ কথা মানলেই আমার ভালো হতো, কিন্তু মানতে পারলাম না।

এত কথার জবাব জানে না কুন্দলাল। বিব্রত বোধ করলো। কিন্তু জবাব শুনতে চায়না বাহার। কথা বলতেই চায়। গঙ্গার জলে আলোকিত বাড়ীখানার ছায়া পড়েছে। নৌকোর উঠ্‌তি-নাম্‌তিতে আলোর ফোঁটাগুলো উঠছে নামছে। ওপার থেকে ঝোড়ো বাতাস আসছে। দূরে ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে। এই সব-কিছুর মধ্যে বাহারকে কেন যেন বড় ক্লান্ত মনে হল কুন্দলালের। বাহার বললো—তবে কি জানেন—আপনি শেঠ মানুষ, কতজন আপনার দয়া পেয়ে ধন্য হবে, তখন দু'দিন ধরে কার নাম হয়েছিল কোন্‌-সে বাঈজী, তার কথা আপনিই ভুলে যাবেন···তাই হয়। কেউ কারও কথা মনে রাখেনা, বাবুজী।

ঘর খালি হয়ে গিয়েছে। চাকররা রঙীন শার্সী বসানো মস্ত দরজা-গুলো বন্ধ করছে। কোণের বাতি নেভাচ্ছে। চমক ভাঙল বাহারের। কুন্দলালকে বিদায় জানিয়ে দ্রুত নেমে এল। গাড়ীতে উঠে বসল। ছুটতে ছুটতে এসে একজন একখানা মোটা খাম দিল বাহারের হাতে। নিয়েও খুলতে ইচ্ছে হলনা বাহারের। মাথা হেলিয়ে বসেই রইল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ক্লান্তিতে পা ভেঙে পড়ছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল বাহার। ঘরে নেই আনন্দ। কোথায় গিয়েছে? পনেরো-ষোল দিনেব অক্লান্ত পরিশ্রম আব অপূর্ণ ঘুমে বাহারের চোখ জড়িয়ে এল।

ঘরে ঢুকল আনন্দ আরো খানিক বাদে। অনেকদিন বাদে নেশা করে বড় ভালো লাগছে তার। সেই চোখে বাহারকে দেখে তার আরো ভালো লাগল। জরির চটিটাও পা থেকে খোলেনি বাহার। নিচু হয়ে খুলে নিতে গিয়ে খামখানা চোখে পড়ল। মাটি থেকে শিথিল-হাতে তুলে নিতে গিয়ে খামখানা খুলে একরাশ নোট ছড়িয়ে পড়ল ভাঁজ খসে। অনেক টাকা। দেখে নেশাটায় ছুট লাগল। একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল আনন্দেব মুখে, আর হঠাৎ ঘুম ভাঙতে সেই মুখই দেখল বাহার। চোখদুটো ঘুম ও বিস্ময়ে জড়িয়ে চেয়ে রইল। হাসলে কোন্ পরিচিত মানুষকে এত অপরিচিত দেখায়?

॥ আট ॥

তানপুরা থেকে তার ছুটে গিয়েছে। এ-ভাঙা আর জোড়া লাগবে না। মেরামত করলেও তেমন করে আর সে-সুব বাজবে না। এ কথা জেনেও শেষ চেষ্টা করবার লোভ সামলাতে পারেনি বাহার। একখানা ভাঙা কাঁচ যদি কুশলী শিল্পীর হাতে জোড়া লাগেও, তবু মাঝখানের ক্ষীণ রেখার ব্যবধানটুকু মিলোয় না। মানুষে মানুষে যদি একবার মন ছুটে যায়, তবে সে-ভাঙা জোড়া-লাগা আরো অনেক কঠিন, তা হয় না। আঁকড়ে ধরলেও রাখা যায় না। মন শুধু দূর থেকে দূরে চলে যায়।

'শিকস্ত্ আয়না ঔর শিকস্ত্ দিল্ .
জোড়ী নহীঁ যাতি, জোড়ী নহীঁ যাতি।'

বুঝেও বুঝতে চায়না বাহার। এতবড় বিচ্ছেদের কথা ভাবতে গেলে জগৎ-সংসারটা আঁধার হয়ে যায় তার চোখে। অন্য কোথাও যদি চলে যেতে পারে আনন্দকে নিয়ে—দিনগুলোকে ভ'রে দিতে পাবে স্নেহে প্রেমে মমতায়, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে—এই কথাই সেই রাতে আনন্দকে বার বার বুঝিয়েছিল বাহার। আনন্দও আর ভাবতে চায়নি। কিছু বিশ্রাম, কিছু শান্তির প্রত্যাশায় ছেলেমানুষের মতো বলেছিল—সব দিতে পারো বাহার? আর কিছু চাই না, এই যে শূন্য মনে হয় সব কিছু, নিঃসঙ্গ মনে হয়, নিজেই নিজের কাছে একটা বোঝা হয়ে উঠেছি, তার হাত থেকে আমায় মুক্তি দিতে পার বাহার? আমাকে নিয়ে আমি আর পারি না!

কোন ক্ষমতা তার নেই জেনেও, অন্ধ আশায় বলীয়ান হয়ে আশ্বাস দিয়েছিল বাহার। বলেছিল—চলো আমরা কোথাও চলে যাই আনন্দ।

তখন বালকের মতো উৎফুল্ল হয়ে আনন্দ বলেছিল—চলো গয়া যাই, বাহার। যাবে?

এত জায়গা থাকতে ঘরের কাছে গয়া যেতে চাইলো কেন আনন্দ, বাহার জানে না। তবু বললো—তোমার ভালো লাগবে আনন্দ?

—খুব ভালো লাগবে বাহার, খুব। তুমি জান না বাহার, আমি তো ছিলাম সেখানে।

একে অপরকে সুখী করবার জন্য চেষ্টায় বড়ই সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই জোর করে আরো বেশী উৎসাহ প্রকাশ করে রাজী হয়ে গেল বাহার।

বাড়ীখানা গোবাছুয়ার ঝর্ণাটা ছাড়িয়ে বাঙালী ডাক্তারবাবুর বিস্তীর্ণ ক্ষেতীর মধ্যে। সাদা চুনকাম-করা দেয়াল, খড়ের নিচু চাল। মস্ত একটা ইঁদারা আছে, তার থেকে মহিষের চাকিতে জল তুলে ক্ষেতে

ঢালে মৌজার চাকররা। জানালা খুললে চোখে পড়ে সবুজ ঢেউ-খেলানো ক্ষেত, তার ওপাশ দিয়ে চলে গিয়েছে বুদ্ধগয়ার রাস্তা। তারও পেছনে শেরঘাটি ও ডোভার পাহাড়ের আন্দোলিত বহিঃরেখাটি বিবাগী মনকে হাতছানি দেয়।

গ্রীষ্মের শুরু। বেলা আটটা না বাজতেই প্রখর তাপ শুরু হয়। দরজা-জানালা বন্ধ করে খসখস ভিজিয়ে দেয় মালী। তপ্ত বাতাসে ক্ষেতের ওপব আগুনের হল্‌কা ওঠে। জামগাছের স্বল্প ছায়ায় মোষটা ঘুবে ঘুরে চাকি টানে আব তার নাক মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ে।

এই পরিবেশে ঘর বেঁধেছে বাহার আর আনন্দ। অজস্র শান্তি। বিস্তৃত নীরবতা। কথা-ও কমে এসেছে তাদের মধ্যে। বিশ্রামেব ইচ্ছাটাই প্রবল। পাঁচ বছরে এতো ক্লান্তি জমেছিল কে জানতো। অনেক কথাই তো বলা হল, এখন করজোড়ে ক্লান্তমনে বসে জীবনটাকে সহজে গ্রহণ কববার সাধনা।

সেই নগব-জীবনের হট্টগোলেব পর সুবিশাল অবসরের আকাশে দাঁড়িয়ে দুটি নরনারী পরস্পরকে ভালবাসাব সকরুণ প্রয়াসে ব্যস্ত। জীবনটাকে পূরিয়া-রাগেব বিলম্বিত ছন্দেব সুবে বাঁধবার চেষ্টা করে বাহার।

অতি প্রত্যূষে, বাত থাকতে উঠে তাবা চলে যায়। কোনদিন ব্রহ্মযোনিব পথ ধরে চড়াই-উৎরাই বেয়ে পৌছায় তারা। পাহাড়ের চূড়ায় ছোট্ট ঘরটিতে ব'সে সূর্যোদয় দেখে। ইতিহাসের স্বর্ণ-অতীতের গৌরব-সমৃদ্ধির পর বিহারের ভূ-প্রকৃতি আজও যেন কোন বৈরাগ্যের সাধনায় ব্যস্ত। তার সৌন্দর্যে বৈরাগীব গৈরিক নিঃসঙ্গতা আছে। সেই ধূ-ধূ ছবিখানাই ফুটে ওঠে প্রথম-কিরণ-সম্পাতে। ক্লান্ত চবণে নীরবে ফিরে আসে দুজনে। ঝর্ণার জলে স্নান করতে গিয়ে পাথরের ওপর এলিয়ে প'ড়ে স্বল্পজলে বালির শয্যায় মাছের খেলা ছ্যাখে

আনন্দ। জল থেকে উঠতে আর চায় না। সমস্ত দিনটাই যার মুঠোর মধ্যে, তাড়াতাড়ি করবার তার কোন্ প্রয়োজন? এ আলস্যও তো বিলাসিতা। ঝর্ণার স্বচ্ছ জলে সোরাই ভরে নিয়ে সিক্ত কেশে ফিরে আসে বাহার। কাঠের উনোন ধরিয়ে চা করে। সপ্তাহান্তে বাজার নিয়ে আসে মালী। বাঙালী ডাক্তারবাবুর ক্ষেতী থেকে টুকরি ভরে তরকারি বেচতে আসে দেহাতী মেয়েরা। দুধ আনে, কখনো কুণ্ডী থেকে মাছ-ও আনে।

দুজনে একসঙ্গে চা খায়। মালীও বসে সেই সঙ্গে। সেই সময় অনেক দরকারী কথার আলোচনা হয়। চিত হয়ে শুয়ে পড়ে আনন্দ সিগারেট খায় আর দুটো-একটা প্রশ্ন ক'রে আলোচনাটা জমিয়ে তোলে। গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের মাহাত্ম্য, বিষ্ণুপুবায় বটগাছটার তলায় প্রেতিনী-কন্যার আনাগোনা, মহাবীরজীর পিতার ফুলগাছের শখ, কলিতে রামজী আবার অবতার হবেন কিনা—এইসব বিষয়ে জোর আলোচনা হয়। আপ সাঁচ্চা তো জগৎ আচ্ছা এই মোক্ষম নির্দেশ দিয়ে উঠে পড়ে মালী। ততক্ষণে তাপ বাড়ছে। পথের ধারের বটগাছটার তলায় জলসত্র খুলে বসেছে মালীর বৌ। ভিজানো ছোলা আর গুড়-জল দিচ্ছে সে তৃষিত পথচারীদের।

সঙ্গীত-সাধনার মতোই সম ও তালের সুসমঞ্জ ছন্দে দিনটাকে ভরে তুলতে চায় বাহার। সেবা ও যত্নের মাধুরীতে মধুর করে দিতে চায় জাগর প্রহর। দৈনন্দিন জীবনের সামান্য কাজগুলির মধ্যে এত আকর্ষণ ছিল তা তো আগে জানেনি বাহার! অন্ধ আকর্ষণে আঁকড়ে ধরেছিল জীবনটাকে। ভেবেছিল জোর করে ধরলেই বুঝি ধরে রাখা যায়। 'ভালবাসি, ভালবাসি' এই কথাটা পঞ্চমে বেঁধে বাজালেই বুঝি সে-সঙ্গীতের কল্লোলে মনপ্রাণ ডুবিয়ে দেওয়া যায়। আজ মনে হয় সেগুলোই ভুল হয়ে গিয়েছে। নির্জনে বসে একটি কামনাকে মন্ত্রের মতো নিত্য উচ্চারণে হৃদয়ে উপলব্ধি করবার ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল।

হাজারটা উগ্র রঙের বেসাতি তুলে রেখে সাদা-কালোর সুস্পষ্ট রেখাতে ধীরে ধীরে তাদের দ্বৈত জীবনের পটভূমিটাতে আলপনা আঁকবার প্রয়োজন ছিল। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।

ভুল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেরি হয়েছে কি? এত কি নিষ্ঠুর হবে দেবতা যে আর সময় মিলবে না? এই তো আজ সমস্ত কিছু পরিহার করে শুধু আনন্দকে পুনর্বাসন করবার সাধনা করছে সে। কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গিয়েছে আনন্দ। জমির খাঁ সাহেবের পুরববাজি তানতরকীবের উত্তরাধিকারী আনন্দের যে কণ্ঠ শুনে একদিন লক্ষ্ণৌ-আগ্রার সমাজ ধন্য-ধন্য করেছে—আজ সে কণ্ঠ ক্লান্ত। ভাস্বর হবার প্রতিশ্রুতি ছিল যে শিখার মধ্যে, সে আজ ধূমমলিন। কেন এমন হল? নিজেকে শত শত ধিক্কার দেয় বাহার। তার প্রেম ছিল অধিকার-লোলুপ। দুইহাতে আকড়ে ধরেছিল বলেই আনন্দের জীবনের পথে কুসুমের মালা না হয়ে, সে হয়ে উঠল বোঝা।

ভুল হয়েছে তার। প্রায়শ্চিত্ত-ও করবে সে-ই। মানুষটা নিজের জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যেন নিজের মধ্যেই বিবাগী হয়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবে বাহার। এখন সে-ই তার সাধনা।

ঘরের কাজ করে পরম যত্নে। বেলা হলে চুলো ধরায় কাঠকুটো জ্বেলে। বড় যত্নে আহারের আয়োজন করে। ঘর ঝাঁট দিয়ে যত্ন করে থালা সাজিয়ে আনে। কালো পাথরের বাটি কিনে এনেছে মন্দিরতলা থেকে। তাতে দই পাতে। দুধের সর তুলে পরতে-পরতে জমিয়ে রাখে পাথরবাটিতে। দেখে দেখে হাসে আনন্দ। বলে—কি কর বাহার? এখানে কি সংসার পাতাতে এসেছি আমরা?

যে কাজকে আনন্দ উপহাস করছে, তাতেই যে তার অনেক সুখ, এ লজ্জা রাখবে কোথায় বাহার? হাসতে গিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়

মুখ। চেয়ে থাকে আনন্দের দিকে। তার মন বুঝে আনন্দ বড় দুঃখ পায়। নিজেই একসময় বলে—তোমার বড় কষ্ট বাহার!

—না আনন্দ।

বাহারের গৃহস্থালিতে সায় দিয়ে আর উৎসাহ প্রকাশ করে ক'টা দিন যায়। কিন্তু আনন্দের নিজের মনেই যে শূন্যতা-বোধ আর হাহাকার, তার তাগিদে অস্থির হয়ে ওঠে আনন্দ। ভালো লাগে না, আর ভালো লাগবে না। মুক্তি চাই। মুক্তি দাও বাহার!

মুক্তি চায় সে? ছি ছি—সে কি অকৃতজ্ঞ? এই যে মেয়ে তার জন্যে জীবনটাকে বইয়ে দিল অবহেলে, তাকে সে ছেড়ে যেতে পারে? নিজের হাত থেকে নিজেকে এড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়ে আনন্দ। সকাল যায়, দুপুর যায়—বোধগয়ার মন্দিরের পথ ধরে কখনো চলে যায় লীলাজনের তীরে। শান্ত পরিবেশ। অনেক বছর ধরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটা। দুনিয়াটার সৃজনে স্রষ্টার আশীর্বাদ ছিল। সে আশীর্বাদকে জীবনে ফলবন্ত করে তুলতে হলে প্রয়োজন ছিল যে ত্যাগের ও সাধনার, সে প্রয়োজন আজও ফুরোয়নি। হাজারটা অসঙ্গতি-ভরা মানুষের জীবন, অথচ সেখানেই শিব ও সুন্দরের আসন পড়ে যুগে যুগে। এই অসঙ্গতির বেদনা যে অনুভব করেছে, তাকে তো পথে বেরুতেই হবে।

শাক্যবংশজাত রাজপুত্র তাদেরই একজন। মানুষের বেদনা দূর করতে দেবতা নয়, মানুষই বেরোয় ভিক্ষাপাত্র হাতে, মানুষেরই দরজায় ডাক দিয়ে ফেরে। সেই অনন্যচরিত্র মানুষকে আমরা দেবতার আসনে বসাই।

ইতিহাসের কথা আনন্দ জানে না। তবু ভালো লাগে তার মন্দিরের শান্ত পরিবেশ। মন্দিরগাত্রের প্রস্তরে উৎকীর্ণ সুষমা সুন্দর লাগে। গৈরিক, লাল ও পীতবসন ভিক্ষুদের সৌম্য মুখচ্ছবি ভালো লাগে।

মন্দিরের পেছনে ফলের বাগান। স্বল্পতোয়া অন্তঃসলিলা লীলাজনের বিস্তীর্ণ বালির চড়ায় ছায়া ফেলে আনন্দ চলে যায় আরো পেছনে। নদীর বাঁকে আমগাছের ছায়ায়, যেখানে ভাঙা বুদ্ধমূর্তির স্তূপ। বুদ্ধমূর্তিকে সিঁদুর লেপে ফুলের মালা পরিয়ে সেখানে বসে থাকে যে-বৃদ্ধ, তাকে আনন্দের ভালো লেগেছে। বড় ভক্ত মানুষটি। বুদ্ধকে মহাবীর বানিয়ে পুজো ক'রে কোন্ শাস্ত্রের সে অবমাননা করেছে আনন্দ জানে না। কিন্তু এটুকু জানে যে, অন্তরধর্মের কাছে কোন ভুল বৃদ্ধ করেনি। ভক্তির ছাড়পত্র মিলে গেছে তার। বৃদ্ধকে দেখে আনন্দ প্রশ্ন করে—কি মিশ্রজী, কুছ্ মিলা ?

—হাঁ জী, আনন্দ মিলা।

পাশে বসে পড়ে আনন্দ। এই উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত যুবকের চোখে মুখে যে হতাশা ও দুঃখ লেখা আছে, তা দেখে দুঃখ পায় মিশ্র। বলে —এত অশান্তি কেন তোমার ?

—তোমার অশান্তি নেই মিশ্রজী ?

—যা ছিল তা দিয়ে দিয়েছি রামজীকে।

হেসে চুপ করে আনন্দ। প্রতিবাদ ক'রে এই বৃদ্ধের সরল বিশ্বাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে না। বৃদ্ধকে বলে—কিছু শান্তির বাণী শোনাও তো মিশ্রজী ? কাল কতদূর পৌঁছেছিলে ?

—রাম ও সীতা গুহক চণ্ডালের সাথে দেখা করে গঙ্গাতীরে এলেন। এখন বুঝুন সাহেব, খেয়াল করুন···

ব'লে তুলসীদাসজীর বইখানা খুলে সুস্বরে পাঠ করে বৃদ্ধ। শুনতে গিয়েও উধাও হয়ে যায় মন। এদিকে গাছের গা বেয়ে কাঠবেড়ালী ওঠে আর নামে। বালির চর ভেঙে এপারে এসে বালি খুঁড়ে জল বের করে গাঁয়ের মেয়েরা। তারা দোসাদ ও অছুৎ। সকলের সঙ্গে মিলে গাঁয়ের কুয়োটা ভাগ করে জল নেবার অধিকার তাদের নেই।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রপ্রখর নীরবতায় কোন উৎসবের স্বাদ আছে। তৃষ্ণার্ত মাটি জলের জন্যে হা-হা করছে, চিলের তীব্র চিৎকারে আকাশ দীর্ণ—এই দিগন্তব্যাপী উদাসীন রিক্ততার মাঝখানে মনটা যেন ঘূর্ণি-বাতাসে পাক দিয়ে-দিয়ে ফেরে। বহ্ন্যুৎসবের শেষে ক্লান্ত সন্ধ্যা নামে। তখন দীর্ঘ ছায়া ফেলে আনন্দ ঘরে ফেরে। রুক্ষ চুল, তীব্র চোখের দৃষ্টি—মূর্ত নিঃসঙ্গতা যেন। তার দিকে চেয়ে বোবা হয়ে যায় বাহার। নীরবে চেয়ে থাকে সকরুণ মিনতি-ভরা চোখে।

রাত গভীর হয়। খোলা আঙিনায় শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে উৎকর্ণ আনন্দ নিশীথের মর্মবাণী শোনে। এই বিস্তীর্ণ বিশ্বচরাচরের অন্তরে কোন সঙ্গীতের মহাসমুদ্র নিত্য মন্দ্রিত হচ্ছে। গ্রহ, নক্ষত্র, গাছ, পাতা, পাহাড়, প্রান্তর সব-কিছুই সেই সঙ্গীতের তারে বাঁধা। এত আছে, শুধু আনন্দই শুনতে পাচ্ছে না সে-সঙ্গীত।

ওদিকে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে বাহার। এমনি করে কেটে যায় রাত।

নির্বাসনে বসে ভাঙাকে জোড়া লাগাবার চেষ্টায় ব্যস্ত দুটি নরনারী মানুষের সঙ্গের জন্য যে কি তৃষিত হয়ে উঠেছিল, তা ধরা পড়ে যায়, যখন বিনা আমন্ত্রণেই মোহন এসে হাজির হয়। বোকার মতো হেসে বলে—চলে এলাম। ভাবলাম, অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, চিঠি লেখবার অভ্যেস তো কারোই নেই। আমার কথা ছেড়েই দাও, ও কারবার কোনদিনই করলাম না।

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বাহার। বলে—খুব ভালো করেছ। আমি যে কত সময় বলি, মোহন চলে এলেই পারে। বলো, বলি না আমি?

আনন্দ সায় দেয়। মোহনকে পেয়ে যেন মস্ত ভরসা পেল বাহার এমনি ভাবে তাকে নিজের দুঃখের বারোমাসি শোনায়। বলে—কি মানুষ কি হয়ে গেল মোহন—বলো দেখি আমি কি করি?

রাজরানীর কণ্ঠে ভিখারিনীর আকুলতা। বড় দুঃখ পায় মোহন।

বাহারকে যদি কেউ চেনে, তো সে চেনে। জানে গর্বিত ও ক্ষমতাপ্রিয় তার বহিঃসত্তা। অন্তরে অন্তরে স্নেহ-মমতার কাঙাল বাহার। বড় পরনির্ভরশীল সে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কি হয়েছে বাহার? · কিছু তো হয়নি। আমি তো খুব ভালোই দেখছি তোমাদের।

—ভালোই দেখছ, তাই না?— শিশুর মতোই বিশ্বাস করতে চায় বাহার। মনে হয় বন্ধুজন এসেছে, এবার হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। এই টানা-পোড়েনেব দুঃস্বপ্নটা আর থাকবে না।

অনেকদিন পর সহজ বোধ করে আনন্দও। বলে—বাহার, আমরা বাজার করে আসছি। তুমি একটু চা খাইয়ে দাও আমাদের।

মালীকে চুলো ধরাতে বলে মনেব খুশীতে সংসারের কাজে লাগে বাহার। বাহারকে কাজকর্ম করতে দেখে বড় হাসি পায় মোহনেব। গুনগুন করে গান গায় বাহার অনেকদিন বাদে। পেয়ালা-চামচের টুং-টাং শব্দটাও তার মিঠে লাগে। কৌতুকে হেসে ঘরনী গিন্নীর মতো বলে—তোমরা ঘুবে এসো। দেখ কি করি আমি। অজানিতে তাক লাগিয়ে দেবার কল্পনায় চোখ জ্বলজ্বল কবে বাহারের। ডাক্তারবাবুর বাগানের মালীকে যদি পায়, তো সবজী নেবে কিছু। দুধ কিনবে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আহীবদের ডেকে।

এদিকে মোহনকে টেনে নিয়ে যায় আনন্দ ঝর্ণার ধারে। পাথরের ছায়ায় বসে। কথাটা আনন্দই শুরু করুক, এই ভাব চোখে নিয়ে অপেক্ষা কবে মোহন। আনন্দ কি ব'লে কথা শুরু করবে ভেবে পায় না। বোঝে মোহন। সকরুণ হাসে। বলে—কি, হিসেবে মিললো না?

বিনা ভূমিকাতেই আনন্দ বলে—না। আব পারছি না। যা হল খুব হল। এবাব আমি ছুটি চাই।

—তোমাকে ধরে রেখেছে কে আনন্দ?

—সেখানেই তো বাধা আমার, মোহন। বাহারের কথা ভেবে আটকে যাই। কি জান, দুর্বল হয়ে গিয়েছি। পাঁচ বছর আগেকার মন হলে চলে যেতাম কবে। এখন কেমন যেন জোর পাই না। অথচ এই-যে দিনের পর দিন এমনি করে কাটাচ্ছি—বলো, এ জুয়াচুরি করছি না? বাহারকে ঠকাচ্ছি—নিজেকে ঠকাচ্ছি—কিন্তু বাহার তো সে কথা বুঝবে না।

—বুঝবে না? বুঝিয়ে বলেছ?

—কোন্ মুখে বলব বলো?— উত্তেজনায় আরক্ত হয়ে ওঠে আনন্দের মুখ। বলে—আমি কি একটা কাঁইয়া? গাঁওয়ার ছোটলোক? আমার জন্যে সে কত ছেড়েছে তা কি আমি বুঝি না? কিন্তু বুঝেও মন মানে না। নসীবের পাগলামি—নইলে পাঁচ বছর আগে সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম এক কথায়? আর পাঁচ বছর ধরে আমার জন্যে মেয়েটা তার জীবন মাটি করল? কি হাল হয়েছে ওর বলো! ক'টা কাঁইয়া পাণ্ডা আর বানিয়া-বাড়ী ছাড়া ওকে কেউ ডাকে না। ওর নিজের জায়গা বেনারস, সেখানে কদর হারিয়ে ফেলেছে ও। সে আমার জন্যেই তো? আমি ওকে এমন করে আর মরতে দেখতে পারি না, মোহন।

মর্মে মর্মে দুজনের বেদনা বুঝে অসহায় হয়ে যায় মোহন। বলে —বাহারকে আমিও জানি, আনন্দ। দশ বছর ধরে দেখছি তো। এ যেন সে মানুষ-ই নয়। আসলে মানুষটাকে কেউ চেনেনি আনন্দ। ও নিজে তো জানেই না নিজেকে। আসলে মানুষটা বড় কমজোরী, ছেলেমানুষ, অসহায়। বুঝি বলেই ছেড়ে যেতে পারি না। অত যে জোরালো মনে হয় বাইরেটা, সেটাই ভুল। সবাই ভাবে বাহার খুব তেজী, খুব জোরালো—ও নিজেও তাই ভাবে। কিন্তু দেখ তোমার সাথে মনের কারবার করতে গিয়েই অবুঝ শিশুর মতো সব উল্‌টো-পালটা করে একাকার করল।

মোহনের দিকে অবাক হয়ে চায় আনন্দ। এ যেন সে এক নতুন মানুষকে দেখছে। বুঝে মোহন হাসে।

বলে—বাহার কিন্তু তোমাকেই ভালবাসে, আনন্দ।

—তার ভালবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলেই ছেড়ে যেতে চাইছি। হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল, ক'টা দিন কাটানো গেল সুখে দুঃখে—এখন যে যার পথে যাওয়াই ভালো। জন্মকাল থেকে ঘর জানি না আমি। ছোটবেলা মানুষ হয়েছি ঘাটে শুয়ে, ছত্রীতে খেয়ে। রাজবাড়ীর আদর-যত্নও সইল না। আমার কি আর এত বাঁধন সহ্য হয়?

—তুমি যদি অন্য মানুষ হ'তে তাহলে তোমার ওপর আমি রাগ করতাম আনন্দ, অবিশ্বাস করতাম।

—আমি তো অন্য মানুষ নই। আমি 'আমি'ই।

—জানি। ব'লে উঠে পড়ে মোহন। বলে—যা হয় একটা করতে হবে। চলো শহরে যাই।

সওদা নিয়ে মোহন ঘরে ফেরে। আনন্দ চলে মন্দিরে।

মন্দিরের পথ কালো পাথরে বাঁধানো। পাশ দিয়ে বিপণি-সম্ভার। গয়ার সুবিখ্যাত পাথরের বাসন সারি সারি সাজানো। সেখানে তীর্থকামী যাত্রীদের ভিড়। শুধু পুণ্য নয়, কিছু বস্তুও সঞ্চয় করতে চায় তারা। মায়ার জালটা একবার কাটা আবার ফিরে বাঁধা, এই কাজেই জীবনটা কেটে যায়। স্থানীয় গালার চুড়ির দোকানে ব'সে চুড়ি পরে মেয়েরা। আগুনে গালিয়ে মুখটা ফাঁক করে বালা পরিয়ে আবার জুড়ে দেয় দোকানী। গালার গন্ধ আসে। ফুলের ডালায় জল ঝাপ্টা দেয় ফুলওয়ালী। ভিজে সুগন্ধ একটা ছড়িয়ে পড়ে। নিরাভরণ মন্দির। জল দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে সকালে। চন্দন ও ধূপের সুবাসে শুচি পরিবেশ।

সোপানশ্রেণী নেমে গিয়েছে ফল্গুর বালি-ভরা বুকে। সিঁড়ি ধরে

নেমে যায় আনন্দ। বেলা হবে দশটা। গ্রীষ্মের ভৈরবের পর প্রথম আষাঢ়ের মেঘরাগের প্রহর সমাগত। তারই শ্যাম গম্ভীর প্রশান্তি বিছিয়ে গিয়েছে আকাশখানার কোণায় কোণায়। গাঢ় নীল মেঘের চাদর বিছিয়ে আছে আকাশের অঙ্গনে। স্নিগ্ধ ও ছায়াচ্ছন্ন দিন। এ মেঘে বৃষ্টি হবে না। এ শুধু বর্ষণের আশ্বাস আনল। স্নিগ্ধ করে দিল বাতাস। বর্ষণ আসবে আরও পরে। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ উঠে একদিন ভরে ফেলবে আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাবে শেরঘাটি ও ডোভার রোডের তুই পাশের দীর্ঘ গাছগুলোর ঘন সবুজ পাতায় হর্ষ সঞ্চার করে। টপ্ টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা পড়বে তৃষিত মাটিতে। মাটি শুষে নেবে সেই জল। লাল ধুলো থেকে একটা পরিচ্ছন্ন ও ভিজে গন্ধ আসবে। গোরু ও মোষ নিয়ে ফিরতে-ফিরতে কালো কালো রাখাল ছেলেগুলি মোষের পিঠে শুয়ে গান গাইবে। তারপর নামবে বর্ষণ। ঘনঘোর বর্ষণ নামলে আর নতুনত্বের রোমাঞ্চ থাকবে না। তখন কূলে কূলে ভরে উঠবে ফল্গু, আর বে-ঠিকানা অনেকগুলো জলের স্রোত যেখানে সেখানে পথ কেটে নিয়ে ছুটবে গেরুয়া ধারা বইয়ে। কুয়োগুলোয় জল উঠবে। চাষীদের জল টানবার কষ্ট কমবে। অবসর মিলবে বর্ষণের ক্ষান্তিতে বসে দৈনন্দিন তুঃখকষ্টের কাহিনীগুলো ঝালিয়ে নেবার, আর কৃষাণদের মধ্যে দার্শনিক মানস যাদের, তারা একজনকে দিয়ে রামায়ণ পড়িয়ে দশজন বসে শুনে পুরোনো কাহিনীকেই মনে মনে নতুন ব্যাখ্যা দেবে। চেনা পৃথিবীটা নতুন দূর্বাদলের আবরণে রুক্ষ নগ্নতার লজ্জা ঢেকে হবে নয়নাভিরাম।

সেদিন এখনও দূরে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফল্গুর বালি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আনন্দ জলের দিকে চলে। সামনেই কোন ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক পিণ্ডদান করতে এসেছেন। লোকজন জমে আছে। কাঠের ধোঁয়া উঠছে। ভিক্ষুকরা ভীড় করে বসে আছে।

সহসা বালির উঁচু তীরে দাঁড়িয়ে থেমে যায় আনন্দ। নগ্নপায়ে নগ্নগায়ে উত্তরীয় ধারণ করে দাঁড়িয়ে কে ঐ যুবক? পরিচিত মুখ, পরিচিত কণ্ঠ।

সহসা মনে কশাঘাত লাগে। অস্ফুট নয়, জোরেই আর্তনাদ করে ওঠে আনন্দ।

সমাপ্ত হয়েছে প্রেতক্রিয়া। ফল্গুর জলে অন্ন সমর্পণ করে কুশ-তর্পণান্তে সরে আসে যুবক। কর্মচারীরা ভিখারীদের দান করতে থাকেন। আনন্দ আর থাকতে পারে না। চিৎকার করে ডাকে—শিব!

তাকে দেখে অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শিবের বিষণ্ণ সুন্দর মুখে পরিচিতির হাসি ফুটে ওঠে। চিনতে পেবে বালকের মতো ছুটে আসে কাছে।

শুভ্র পরিচ্ছদে সরযূকে আরো পবিত্র দেখায়। কিন্তু সে রিক্ত মূর্তির দিকে চাইতে পারে না আনন্দ। অনুতাপ ও দুঃখে মাটির দিকে চেয়ে বসে থাকে। এতদিন পদমর্যাদা ও আভিজাত্য সরযূকে অনেক ওপরে রেখেছিল। কোনদিনই সহজে দশজনের সঙ্গে মেলা-মেশা হয়ে ওঠেনি তাঁব। সময় ছিল না, ক্ষেত্রও ছিল না। আজ কিন্তু মাঝখানের অনেক বাধাই নেই। শোক দ্বারাই যেন তিনি অনেক সংস্কার ও প্রথার প্রাচীর উত্তীর্ণ হয়েছেন। যা যা মহার্ঘ মনে হ'ত, তা হয়েছে তুচ্ছ, আর তুচ্ছ জিনিসগুলিও কোন মূল্য পেয়ে বিশেষ হয়ে উঠেছে। সস্নেহকণ্ঠে আনন্দকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন তিনি। বলেন—তোমার কথা অনেক সময়ই বলতেন উনি। শিবকে বলতেন তোমার খবরাখবর নেবার জন্যে। ইদানীং অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তো। কে ভেবেছিল বলো ·এমনি করে আসতে হবে—

জবাব দিতে পারে না আনন্দ। বড় অনুশোচনা হয়।

শিব তাকে ছাড়তে চায় না। বলে—এবার তোমাকে নিয়ে যাব কলকাতা। এবার তোমাকে যেতেই হবে।

শিবের মুখে তারুণ্যের সরল উৎসাহ। সেদিকে চেয়ে বড়-ভাইয়ের মতোই স্নেহ অনুভব করে আনন্দ। বলে—তুমি জান না শিব—আজও কি আর সেইরকমই আছে দিনকাল? চলো বললে আর চললাম?

আর-একজনের কথায় তো চলে এসেছিল আনন্দ—সে কথা শিব তোলে না। বলে—খুব বুঝে কথা বলতে শিখেছ তো তুমি। আগে কিন্তু এরকম ছিলে না। আনন্দদা, মনে পড়ে ছোটবেলার কথা?

সেই দিনগুলোর স্মৃতি বড় প্রিয় আনন্দের কাছে। সেই দিনগুলো স্বার্থপরের মতো তার নিজস্ব। শিবের কথা শুনে স্মৃতি-বেদনাতুর চোখে ঈষৎ হাসে আনন্দ। তার দিকে চেয়ে শিবের মনে বড় দুঃখ হয়। বলে ওঠে—তুমি যা-ই বলো, কি চেহারা তোমার কি হয়ে গিয়েছে—শুনলাম গান-বাজনাও কমিয়ে দিয়েছ—নিজের জীবনটা নষ্ট করবার কি অধিকার আছে তোমার বলো? কলকাতা তোমাকে যেতেই হবে।

—কলকাতায় গিয়ে কি হবে?

—কি হবে কি বলছো! গুণীর কদরের জায়গাই তো বাংলাদেশ। আনন্দদা, তোমার তৈরী জায়গা তুমি ছেড়ে দিয়ে চলে এলে, আর ফাঁকা জায়গা পেয়ে কামাল করে গেল কত জন। তোমার কোন কথা শুনব না আমি। কলকাতা নিয়ে যাবই এবার।

কলকাতা যাবার কথা শুনে আর কিছু না হোক, বর্তমানের এই অচল অনড় অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে মনে করেই ভালো লাগে আনন্দের।

বাহারের নাম একবারও ওঠে না তাদের কথাবার্তায়। শিব যেন ইচ্ছে করেই সে প্রসঙ্গকে স্বীকার করে না। আনন্দের মনেও কুণ্ঠা আসে। অন্য লোকের কথা আলাদা। শিবকে সে ছোটবেলা থেকে দেখছে, তা ছাড়া তার জীবনের ভুলচুকের কথা শিবের কাছে তুলেই বা কি হবে?

তারপরেই নিজেকে মনে করে কাপুরুষ। এ কথাটা তুলতেই লজ্জা পাচ্ছে সে? ছি ছি। বলে—শিব, আমি যাব বললেই যেতে পারি না। আর-একজনকে জানাতে হবে।

—সে কথা আমি শুনেছি। তোমার অনেক খবরই রাখি আমি—তুমি হয়তো জান না। সেখানে আমিই যাব আনন্দদা।

—না না। তুমি যেয়ো না। আমি-ই বলব।

—আমি কোন অসম্মান করব না, আনন্দদা। তুমি ক'দিনের জন্যে বেড়াতে চলেছ, তা-ই বলব। সে কথা বললে তো দোষ নেই?

—না, তা নেই··

—তবে আর কি, আজই চলো জানিয়ে আসি। রাতের গাড়ীতেই ফিরব কিনা।

—আজ-ই?

—হ্যাঁ। তিনমাস হল বেরিয়েছি। মা'র পক্ষে থাকা আর সম্ভব হল না। কাশী প্রয়াগ ক'রে গয়াতে বাবার কাজটা করে যাব সে ইচ্ছেও ছিল।

শিবের কথায়-বার্তায় চালচলনে পদমর্যাদার গাম্ভীর্য না হোক, দায়িত্ব এসেছে। কিছুক্ষণ বাদে আনন্দ জিজ্ঞাসা করে—তোমার দিদি কেমন আছে শিব?

শিব বলে—গিয়েই দেখতে পাবে। আমাদের এখানেই আছে।

॥ নয় ॥

আনন্দ আসবে বলেই সেজেগুজে অপেক্ষা করছিল বাহার। যত্ন করে রান্নবান্না সাজিয়ে, স্নান করে গল্প করছিল মোহনের সঙ্গে। অপরাধীর মতো দীনতা বাহারের কণ্ঠে। কথায় কথায় সকরুণ মিনতির সুর লাগে। কাজল-বিনাই চোখ ঘিরে কালি পড়েছে। কোথায় যেন জোর হারিয়ে গিয়েছে বাহারের। মনটা রয়েছে দুর্বল হয়ে। দেখে মনে বড় মমতা হয়েছিল মোহনের।

বেলা গড়িয়ে গেল। মোহনকে যত্ন করে খাওয়াল বাহাব। পথশ্রমে ঘুমিয়ে পড়ল মোহন।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেলের আলো মেঘলা আকাশকে রঙীন ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। বারান্দার থামে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে আছে বাহার। আনন্দের ওপর রাগ হল।

মোহন বললো—আচ্ছা অবিবেচক মানুষ তো! এখনো আসেনি?

—তুমি কি এখনো ভাবো, ও আর আসবে? না মোহন, আমারই ভুল।

—কি বলছো বাহার?

—ঠিকই বলছি, দেখো। এত ভুল কখনো জোড়া লাগে মোহন?

—বাহার!

বন্ধুর সমবেদনায় হয়তো অনেক কথাই বলে ফেলত বাহার, কিন্তু দোরে এসে দাঁড়াল গাড়ী। আনন্দ একলা নয়, আরো কে যেন এসেছে সঙ্গে।

ঘরে যেই ঢুকল আনন্দ, তার মুখের দিকে চেয়েই কি যেন বুঝল বাহার। একটু বিস্ময়ে চেয়ে রইল। বড় খুশী দেখাচ্ছে আনন্দকে।

মনের খুশী যেন উপ্‌ছে পড়ছে চোখে মুখে। অথচ একটু লাজুক ভাব। যে কথা বলতে এসেছি, বলব কি না-বলব, তাই যেন ভাবছে সে। দেখে অনেক দূর বুঝল বাহার। বললো—কে এসেছেন সঙ্গে ?

—কলকাতার শ্রীনটপুরের কুমার। তুমি একবার গিয়েছিলে···

—তাঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ ? ভেতরে আসবেন না তিনি ?

—সে কথা নয় বাহার। একটা কথা···আমি আজ একবার কলকাতা যাব বাহার।

নিশ্চুপ হয়ে যায় বাহার। কথা জোগায় না মুখে।

আনন্দ বলে—কয়েক দিনের জন্যে···এঁরাও বলছেন।

তাকিয়ে থাকে বাহার। যেন সঙ্কোচ বোধ করছে আনন্দ। চেয়ে চেয়ে বড় মধুর হাসে। বলে—সে কথা বলতে এত কিন্তু করছ কেন ? নিশ্চয় যাবে। ওঁকে ভেতরে ডাকো। তোমার জিনিসপত্র নেবে···গুছিয়ে দেব, সময় লাগবে, উনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন ?

এত সহজ কথা শুনে আশ্বস্ত হয় আনন্দ। বলে—আমি ডাকছি।

—না না, আমিই ডেকে আনছি।

বাহারের বিরুদ্ধে কত যুক্তি-ই আছে শিবের মনে। কিন্তু তাকে দেখে সে দৃশ্যত-ই বিস্মিত হয়।

সস্নেহ অভ্যর্থনার হাসি হাসল বাহার। বললো—আপনাদের বাড়ীতে গান গেয়ে এসেছি, সে হয়তো আপনার মনে নেই। আমার গরীবখানায় একবার বসবেন চলুন।

—আমার একটু তাড়া আছে। আজই যাব···

—নিশ্চয়। কিন্তু ওঁকে তো জিনিসপত্র গুছিয়ে দেব—একটু বসবেন না ?

শিবকে নিয়ে বাহার চলে বাড়ীর দিকে। বলে—আমিই তো বলছি কবে থেকে যে, শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে···এরকম এক জায়গায় পড়ে থাকবার চেয়ে বাইরে ঘুরে আসা অনেক ভালো।

—সেজন্যেই নিয়ে যাচ্ছি আমি···অল্প ক'দিনের জন্য···

—না না, সেজন্যে কি আছে? শরীর আর মনটাই বড় জিনিস। যে ক'দিন ভালো লাগে, দরকার হয়, থাকবেন বৈকি।

শিবকে মোড়া পেতে বসিয়ে আনন্দকে কাছে বসায় বাহার। নিজে ঘরে গিয়ে বাক্স গোছাতে বসে।

আনন্দকে ডাকে বাহার। বলে—ছাখো, সব গুছিয়ে দিলাম। ঠিক আছে তো?

—বাহার!

—আর ছাখো··· আনন্দের দিকে তাকায় বাহার অকুণ্ঠ মমতায়। বলে—ছাখো, এই নাও, কাছে রেখো।

একটা ছোট থলি। অনুমানে আনন্দ বোঝে টাকা আছে তাতে। বলে—কেন টাকা দিচ্ছ বাহার?

—কেন কি?

বালক যেন আনন্দ, এমনি করে বোঝায় বাহার। বলে—টাকা কাজে লাগবে না? কলকাতায় যাবে, ঘুরবে ফিরবে, কি বলছো।

সমাপ্ত আয়োজন। অনেক কথাই বলতে চেয়ে হারিয়ে ফেলে আনন্দ। বলে—আবার আসব বাহার। খুব তাড়াতাড়ি, দেখো।

বাহার হাসে। বলে—আসবেই তো। ক'দিনের জন্যে যাচ্ছ··· ভাবছ কেন বলো তো? মোহন রইল, মালী রইল···আমি খুব ভালো থাকব।

যে সুযোগ খুঁজছিল আনন্দ, তা-ই এমন হঠাৎ এল যে, মনের মধ্যে প্রস্তুতি খুঁজে পেল না সে। আবার বললো—চলি বাহার···!

—নিশ্চয়।

ব'লে সহসা কাছে এল বাহার। আনন্দের হাতে হাত রেখে বললো—ভালো থেকো!

—বাহার!

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ বাহার। তারপর তাকাল আনন্দের দিকে। সে চাহনিতে এত ভালবাসা, এত দুঃখ, এত তৃষ্ণা, এত মমতা একসঙ্গে কথা কয়ে উঠল যে, ভাষাহারা হয়ে গেল আনন্দ। দেখে দেখে একবার চোখ বুঁজল বাহার। তারপর কষ্টে হাসি টেনে আনল মুখে। বললো—কত দোষ করেছি, মনে রেখো না!

—একি কথা বাহার?

—এমনি বললাম।

বেরিয়ে এল বাহার। মালীকে ডাকল জিনিসগুলি বয়ে দেবার জন্যে।

মোহনকে কাছে ডাকল আনন্দ। বললো—মোহন, কেমন করে কি হয়ে গেল ভাই···

—ঠিকই তো হল আনন্দ। তুমি যা চেয়েছিলে তা-ই হল।

—বাহারকে দেখো মোহন। আমি থাকি না-থাকি।

—ঠিক আছে আনন্দ। ভেবো না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমলকী গাছের ছায়াচ্ছন্ন কাঁকর-বিছানো রাস্তা। গাড়ীর দিকে চলতে-চলতে ছোট ছোট কথায় আনন্দকে নির্দেশ দিল বাহার। তার পর গাড়ীতে ওঠবার সময় হেসে বললো—কত ভালো থাকবে তুমি সবই জানি—তবু না বলে পারি না।

গাড়ী ছেড়ে দিল। দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল বাহার। সন্ধ্যা নেমেছে আকাশ ছেড়ে মাটিতে। বোধগয়ার পথ ধরে মোষের গাড়ী চলেছে ক্যাঁ-কোঁ শব্দে ধুলো উড়িয়ে। সাদা পাতলা একখানা ধোয়া শাড়ীর আঁচল দীর্ঘদেহ বেড়ে মাটিতে লুটোচ্ছে, পথের দিকে চেয়ে আছে বাহার একখানা হাত কপালে রেখে—চোখ আড়াল ক'রে, আর

নিঃসঙ্কোচ অশ্রু দুইফোঁটা টলটল করছে কালো চোখে। এই ছবিখানা অনেক দিন পরেও মোহনের মনে পড়েছে। একটা মস্ত বড় শূন্যতা, একটা নিঃসঙ্গ ও একাকী বেদনা বাহারের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গেই অধরে জেগেছে করুণ একটু হাসির স্মিত আভাস। কথা ক'য়ে এই মুহূর্তটাকে ছোট করেনি মোহন। তার একটা নিজস্ব সংযম-বোধ আছে। বিশেষ করে বাহারের সম্পর্কে সে খুবই সচেতন। তাই ধীরে ধীরে সরে এল সে। হাত রাখল বাহারের কাঁধে। ফিরে তাকাল বাহার। বলল—কি?

—চলো বাহার কোথাও যাই।

—শহরে বেড়াতে? না মোহন।

—একটু মৌজ করবো বাহার।

—মৌজ?

না বুঝেই তাকিয়ে রইল বাহার। তারপর একটু হাসল। বললো—মৌজেই তো আছি মোহন!

—তুমি একলা থাকবে?

—বেশ তো।

রাত অনেক হয়েছে। কত রাত তার হিসেব নেই মানুষ দুটোর কাছে। নিচু জানলা দিয়ে আসছে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস। সে বাতাসে গুঁড়ো-গুঁড়ো শীকরকণার আভাস আছে। বর্ষণ নামার আগেই মাঝরাতে ঝোড়ো বাতাস উঠেছে। বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু বাতাসের জোরে সে বৃষ্টিকে উড়িয়ে নিয়ে ঝাপট্টা মেরে বেড়াচ্ছে। বিদ্যুৎ-ঝলকে দেখা যায় গাছগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে হাহাকার করছে। ঘরের বাইরের বিস্তীর্ণ ক্ষেতী ম'থে ফেলছে বাতাস। যেন একটা সমুদ্র উঠিয়ে এনেছে এই রাত্রি, আর বাড়ীটা হয়েছে একটা সঙ্গচ্যুত দ্বীপ।

ঘরের মাঝখানে মাথার ওপর কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো ল্যাম্প দুলছে। ঘরের দরজা-জানালা খোলা। ঝড়ের বাতাস ঘরকে বে-সামাল করে অবাধে আসা-যাওয়া করছে আপন খুশীতে। মনের মানুষ হারিয়ে গেছে বলে ঘরের মানুষের আজ কোন খেয়াল নেই।

মদ খেয়ে-খেয়ে মাতাল হয়েছে মোহন, আর চিবুক হাঁটুর ওপর রেখে কি ভাবছে বাহার। মোহন বলে—কি বলব বাহার, আবার বলি, তোমাকে দুঃখ পেতে দেখলে আমার সয় না।

—আমি জানি।

—আমার মনে হয়, জান না।

—জেনেও কি করতে পারি?

—বিশ্বাস করতে পার।

—আমার বিশ্বাসে কার কি এল-গেল বলো। বিশ্বাস করতে চেয়েও তো দেখলাম। ওসব কথা থাক।

—সবাই আনন্দ নয়, বাহার···আমিও তাকে ভালবাসি, কিন্তু···

চুপ করে রইল বাহার। এই যে মানুষটা মদের ঝোঁকে ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়ছে, একে সে ভালো করেই চেনে। জানে এর কালো বাণ্ডি আর ময়লা কামিজের তলায় যে মনটা আছে, তার পরতে পরতে শুধু মায়া-মমতাই জড়ানো। বাহারের সে বড়ই শুভাকাঙ্ক্ষী। বাহার ভাবে—জানি জানি, সব জানি, কিন্তু সেই একজন ছাড়া অন্য পুরুষ যে দেখলাম না—এখন কি আর চাইলেই মন বদলাতে পারব? বলে—দুঃখ আমি করি না, কিন্তু কি মিললো বলো? মিললো রুখাভুখা পিয়াস একটা। আঁধির মতো এসে জীবনটাকে আমার তছনছ করে দিল।

—সাচ!— বলে আর ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে মোহন। তাকে বালিশ টেনে দেয় বাহার। গড়িয়ে পড়ে মোহন। একখানা নিঃসঙ্গ মনের বেদনা নিয়ে আকাশ-পাতালে খেই ফেলে-ফেলে নোঙর-ফেলার মাটি

খোঁজে বাহার। রাত বাড়ে। শেয়াল ডাকে জানালার পাশে। ঝড়ের মাতামাতি কমেছে। বৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও কম। মেঘ উড়ে গিয়েছে।

গভীর রাত। মেঘ কেটে চাঁদ উঠেছে। তাতে জ্যোৎস্না হয়নি। রাতের রংটা শুধু স্বচ্ছ হয়েছে। উঠে দাঁড়ায় বাহার। মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে পাশের ঘরে যায়। তাদের দ্বৈত জীবনের শেষ অধ্যায়ের সাক্ষী ঘরখানা। গৃহস্থালির আয়োজনগুলো ছাখে। দ্বৈত জীবন আবার কি? ছুটো জীবনের ধারাই ছিল ছুই মুখে। তাদের এক করবার চেষ্টাটাই তো বাহারের পাগলামি। যে শাখায় ফল ধরে না, ফুল ফোটে না—তার পেছনে যে মালীর যত্ন ছিল তা কি দর্শকজন মানবে? বাহারের সমস্ত চেষ্টার পেছনে যে আন্তরিকতা ছিল তাই বা কে জানবে? মানুষের জানা-চেনার কথা সে ভাবে না। কিন্তু আনন্দ? আনন্দও ভুল বুঝেই গেল? এই আঁধার রাতে একলা দাঁড়িয়ে মনটাকে নগ্ন করে দেখল বাহার, সেখানে তো কোন অভিমান বা অভিযোগ নেই। আর সকলে যাই বলুক, নিজেকে সে অবিশ্বাস করে না। তার প্রেম সত্যি ছিল, তাই চেষ্টা আন্তরিক ছিল। তবু ভুল ছিল নিশ্চয় কোথাও। আনন্দ একদিন কি কবিতা শুনিয়েছিল তাকে?—

'ভুল, ভুল সবই—ভালো-লাগা, ভালবাসা।
জন্ম জন্ম চলে যাওয়া, ফিরে আসা—
সবই বিভ্রম, জানি সে তত্ত্বকথা।
তবু ভুল করে ভালবাসি বার বার,
ভালো লাগে সব, যারা ভালো লাগিবার—
ভ্রান্তিবিলাস, সনাতন মত্ততা।'

কবির কথা ঠিক। প্রেম যদি ভুল হয়, তবে ভুল করেছে বাহার। তাই তো তার তপস্যার শেষে কোন জলবাহী মেঘের প্রসন্ন বর্ষণে ভরে

উঠল না বাগিচা। মিললো শুধু নিদাঘের দাবদাহ আর ভুখামাটির বোবা পিয়াস।

ভুলের বোঝা এখানেই নামাবে বাহার। আর জের টানবে না। স্যুটকেস খুলে কাগজ কলম বের করল বাহার। মোমবাতিটা তেপায়ায় বসিয়ে টেনে আনল সামনে। লিখতেই কি জানে? গান ছাড়া অন্য ভাষায় তো বাহার কথা বলতে শেখেনি। সেই ভাষাই আনন্দও বুঝতো। সে শুধু গান-ই জানে। যা জানে তাতে আজ তার কাজ চলবে না। লিখতে হবেই। মন স্থির করে লিখতে শুরু করল বাহার।

মোহনের ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। বাহারের সাড়াশব্দ নেই। সম্ভবতঃ সেও ঘুমোচ্ছে। উঠে বসল মোহন। পাশের ঘরে কুকুর এসে রান্নার সাজসরঞ্জাম ঘাঁটছে। তাকে দেখে পালালো কুকুরটা। কিন্তু বাহার কোথায় গেল? শোবার ঘরে?

বাহারের খাটিয়াতে বিছানার ওপর দুখানা চিঠি আব কতকগুলো নোট। কি ব্যাপার? বন্ধ লেফাফায় ঠিকানা নেই। আর একখানায় তার নাম লেখা। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল মোহন। লেখা আছে ঃ

মোহন—ভুল কববো আমি, আর কষ্ট পাবে অন্যবা, এ-ভুল আব টানলাম না। মালীকে নিয়ে স্টেশনে চললাম। ক'দিন ঘুবে-ফিরে আসি। টাকা বেখে গেলাম, তুমি বেনারসে ফিরে যেয়ো। যদি আনন্দ ফিরে আসে, তাকে অন্য খামখানা দিয়ো। আমার খোঁজ কোরো না। সময় হলেই বেনারসে ফিরব। —বাহার

'কারবার!' ব'লে বসে পড়ল মোহন। দুই হাতে মাথার চুলগুলো ধরে বসে রইল।

ঘুরে-ফিরে দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল কুকুরটা। কি-না-কি বুঝে মুখ তুলে হ্রস্ব একটা আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল হঠাৎ। পরিত্যক্ত বাড়ীটাও যেন হা-হা করে উঠল নিদারুণ এক রিক্ততায়।

॥ দশ ॥

তৃষ্ণার্ত পথিক যেমন করে সরোবরের দিকে ছুটে আসে, তেমনি প্রত্যাশা নিয়েই ইন্দুর কাছে আসে আনন্দ। ইন্দুর শান্তস্নিগ্ধ ও গভীর স্নেহের জন্যে মনটা তার কাঙাল হয়ে উঠেছে। ইন্দু তাকে জানে, বোঝে ; তার কাছে নয় অপরাধ-ই স্বীকার করবে আনন্দ। তাতে কোন লজ্জা নেই। দুজনে দুজনের কাছে চেনা মানুষ। ইন্দু তার অনেক ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে দেবে স্নেহ-মমতা দিয়ে।

দেখা করতে আসে আনন্দ অধীর আগ্রহ নিয়ে। তবু ইন্দুকে দেখে মনে একটা ধাক্কা খায় আনন্দ। পশ্চিম মহলটা ছিল যোগীশ্বরের খাস। সে ঘরগুলি তেমনি রেখে নতুন মহল তুলেছে শিব। যোগীশ্বরের বৈঠকখানা, স্টাডি, জাপানী ড্রয়িংরুম, কাঁচ-বারান্দা —সব নিঝুম। বন্ধ জানালার রঙীন কাঁচ দিয়ে আলো আসে না। কয়েকটা অদ্ভুত রঙের ছায়া পড়ে ঘরগুলোকে আরো রহস্যময় করে তোলে। এই পশ্চিম মহলেরই প্রান্তে থাকে ইন্দু। বড় নির্জন এদিকটা, তাই তার মা'র আপত্তি ছিল। কিন্তু একা থাকতেই চায় ইন্দু। বুঝে আর কিছু বলেননি মা।

অনেক কথাই মনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সব কথা ধীরে থেমে যায়। যে তরুণ সুন্দর মুখের ছবি মনে আঁকা ছিল, তার সাথে এ বিষাদ-প্রতিমার মিল কোথায় ?

ভোরবেলা স্নান করেছে ইন্দু। কালোপাড় সাদা শাড়ী পরেছে। গৌরদেহে আভরণ নেই বললেই চলে। যা না থাকলে নয়, তাই-ই

হাতে গলায় চিকমিক করছে। সীমন্তে সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখা। ঘন চুলের মধ্যে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে লাবণ্য কোথায়! হাসল ইন্দু আনন্দকে দেখে। সে হাসিতে কোন উজ্জ্বলতা নেই। ভেতর থেকে যেন নিভে গিয়েছে মানুষটা। সমস্ত চেহারাটাই হয়ে গিয়েছে নিষ্প্রভ।

আনন্দকে দেখে ইন্দু একটু হেসে মাথা নিচু করল। কিছুক্ষণ গেল নীরবে। তার পর বললো—কি দেখছ?

—তোমাকে।

—কি রকম দেখছ?

—কি বলব বলো!

—যা-হয় বলো একটা···

—কেমন আছ ইন্দু?

—তুমি কেমন আছ আনন্দদা?

—ভালো।

—ভালো থাকবার চেহারা কি এই? কি হয়ে গিয়েছে চেহারা বলো তো? এত নাম যশ করেছ···খবর তো রাখি! ভাবলাম, যাক্ আনন্দদা এবার সুখের মুখ দেখল। নাম ক'রে ফেলেছে, সবাই একডাকে চেনে···

—ওসব কথা থাক্-না ইন্দু···

—কেন, তোমার যশ-খ্যাতি শুনে আমাদের ভালো লাগতে নেই বুঝি?

নিজেকে আর চেপে রাখতে পারে না আনন্দ। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—সে কথা ছেড়ে দাও ইন্দু, তোমার কেন এমন চেহারা হল? বলো ইন্দু, কেমন করে কি হল?

জবাব দিতে গিয়ে অধর দংশন করে আত্মসম্বরণ করে ইন্দু। ঈষৎ তীব্র সুরে বলে—আমার কথা জানতে চেয়ো না। করুণা আর

সহানুভূতি আর ভালো লাগে না। আরো ভালো কি হবে? খুব ভালো থাকব, সুখী হব—তাই কি কথা ছিল? সব এমনি-এমনি হয়, না?

তার উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে বিব্রত হয় আনন্দ। বলে—চুপ করো ইন্দু, চুপ করো—আমি বুঝতে পারিনি, ভুল হয়েছে আমার।

চুপ করে ইন্দু। কিন্তু উত্তেজনায় গণ্ড কপাল লাল হয়ে রক্তোচ্ছ্বাস উঠে আসে। নিজেকে সংযত করতে গিয়ে কাঁপে অধরোষ্ঠ। তারপর হঠাৎ বলে—আমাকে গান শেখাবে আনন্দদা?

অবাক হয়ে যায় আনন্দ। বলে—তুমি গান শিখবে? আমার কাছে?

হাসে ইন্দু। বলে—মনে পড়ে আনন্দদা? এই ঘরে, বাবার পায়ের কাছে বসে গাওয়া নিধুবাবুর গান?

আনন্দ চেয়ে থাকে স্মৃতির বাষ্পভরা চোখে। নিজের কিশোর-কণ্ঠ স্মৃতির অনুরণনে যেন শুনতে পায়—

'ভালবাস না বাস,
আমি তো বাসিব ভালো
যাবৎ জীবন আশ—'

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। মহারাজের বিদেহী সত্তা যেন দুজনের স্মৃতিতে প্রাণ পায়। মনে হয় সেই প্রসন্ন ললাট, মধুর হাসি। নীরব স্মৃতিভারাতুর মুহূর্ত।

আনন্দ বলে—সত্যিই গান শিখবে ইন্দু?

হঠাৎ আগেকার মতো কৌতুক করে হাসে ইন্দু। বলে—আমার এখন অনেক স্বাধীনতা, জানো না? কত সম্পত্তি আমার, কত টাকা, একটা স্টেটের আমি বৌ-রানী, সে কথা বুঝি ভুলে গিয়েছ?

—আমাকে কিছু টাকা দাও তাহলে।

—কি করবে?

—দেশে দেশে ঘুবব।

—সত্যি যাবে আনন্দদা ?— উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ইন্দু ছেলেমানুষী কল্পনায়। বলে—যাবে? চলো-না দেশে দেশে ঘুবি···এখানে, সেখানে···যাবে ?

—অনেক টাকা হয়েছে, তাই না ?

—হ্যাঁ ··হয়েছ তো— আবার হাসিতে কৌতুক ফোটে। —বসে থাকো-না, দেখতে পাবে ইস্কুল, হাসপাতাল, সেবাশ্রম—কত দানধ্যান কবব বসে বসে।

—পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ একেবাবে ?

—ধবলাম কবে যে, ছাড়লাম বলো। তবে বাবাব জেদে সংস্কৃত পড়ছিলাম নতুন কবে। বাবাই আই-এ'টা পাস করালেন ব'লে ব'লে। বাড়ীতে আবাব পড়াশুনা ধরেছি, দেখি যদি উৎবোতে পারি বেড়াগুলো। একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। ধর্মকর্ম আমার আসবে না, সে আমি বেশ বুঝেছি প্রয়াগ-কাশী ঘুবে এসে।

—কবে গিয়েছিলে বেনাবস ?

—বছব দুয়েক আগে। তোমাদের বাড়ীতেও গিয়েছিলাম। তোমরা তখন লক্ষ্ণৌ-এ।

—'ও।' নৈর্ব্যক্তিক হয়ে যায় আনন্দেব মুখ। উঠে দাঁড়ায় অতর্কিতে। বলে—আমি চলি ইন্দু।

—কেন, রাগ কবে যাচ্ছ? বাগ কববাব কি আছে? ভেবেছিলাম তোমাব যাকে ভালো লেগেছে, তাকে একবার চোখ ভরে দেখব। তাকে আমারও ভালো লাগতো নিশ্চয়।

দাসী খবর দিয়ে যায় পণ্ডিতমশাই এসেছেন। সুযোগ নিয়ে উঠে পড়ে আনন্দ। ইন্দু বলে—আবার এসো। কেমন?

—আসব।··· বেবিয়ে এসে পাঞ্জাবির পকেটে দুই হাত রেখে চলতে-চলতে আনন্দ ইন্দুর কথা ভাবে। শিব কিছু কিছু বলেছে

তাকে। বিয়ের ফলে সুখী হয়নি ইন্দু। যোগীশ্বরের বংশ যেমন শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও উদারতার জন্য পরিচিত, ইন্দুর পতিকুলের সে গৌরব নেই। বিলেতে সাত বছর বাস করে যে-ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন ইন্দুর স্বামী, তাতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন যোগীশ্বর। ভেবেছিলেন, নতুন দিনকালে এমনি সব শিক্ষিত ছেলেই দরকার। কিন্তু ছেলের দিকের অনেক ইতিহাস ছিল চাপা। প্রথম অষ্টমঙ্গলের পর যখন জোড়ে ফিরল ইন্দু, তার মলিন মুখ দেখেই চিন্তিত হয়েছিল সবাই। শিব বলেছিল—জানেন তো, দিদি কিরকম চাপা মেয়ে···কিছুই বলেনি। উপরন্তু জামাইবাবুই বাবাকে শুনিয়ে গেলেন, অত্যন্ত স্বাধীনভাবে মানুষ করা হয়েছে দিদিকে। বাবা দিদির হয়ে ভালো কথাই বলেছিলেন। অনেক কথা চেপে রেখেই দিদি দু'বছর ছিল ওখানে। কিন্তু বিলেত থেকে যখন তাঁর ইংরেজ-বৌ দুই ছেলে নিয়ে এসে উপস্থিত হল, তখন আর থাকা সম্ভব হল না। নিজে থেকেই চলে এল দিদি।

ইন্দুর কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিল আনন্দ, হঠাৎ পশ্চিমের বৈঠকখানার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বারান্দার দিকের জানালা খোলা। এই ঘরের সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি জড়িত। সতেরো বছর আগে এই ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা পথের ছেলে। সাদর সম্ভাষণে তার লজ্জা ঢেকে দিয়েছিল এক রাজার মেয়ে। আবার পাঁচ বছর আগেকার একটা ছবি মনে পড়ল তার। সে-রাতে এই ঘরে বেলফুলের মালার চাঁদোয়া পড়েছিল। টানা ফরাসে আসর বসেছিল, আর গোলাপী বেনারসী পরে বসেছিল বাহার। কি সাজ-ই সেজেছিল! বড় সাজতো বাহার তখন। যত চড়া-চড়া রং পছন্দ ছিল তার। রঙে রঙে মিলছে না, তবু জোর করে সে মানাবেই। গোলাপী, সবুজ, জর্দা, জাফরান, নীল, বেগুনী—সে রং-বেরং। ঠিক চলে আসবার সময়ই কেন যেন বড় নিরাভরণ দেখাচ্ছিল···প্রথম যেন

চোখে পড়ল আনন্দের, চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে বাহারের। হঠাৎ নিজের মনের চলাফেরা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল আনন্দ। বাহারের কথাই ভাবছে সে···তার কথাই মনে হচ্ছে তার ?

এত বদলে গিয়েছে আনন্দ, যে দেখে-দেখে অবাক মানে শিব। এমনিতেই ব্যস্ত মানুষ সে···ইচ্ছে থাক বা না-থাক, এস্টেটের কাজের দায়িত্বও তারই ওপর। সেই গুরু ভার নিয়েই সে বিব্রত। আনন্দকে পেয়ে খুব ভালো লেগেছিল তার। মনে হয়েছিল এবার পশ্চিমের বৈঠকখানাটায় আবার বাতি জ্বলবে। কয়েকদিন বিশেষ করে আনন্দের মাইফেল লাগিয়ে গান-বাজনা করা যাবে। আনন্দের গত কয়টা বছর পাগলামিতে কেটেছে। বরানগরের বাড়ীতে যদি স্থিতি করে দেওয়া যায় আনন্দকে উপযুক্ত সম্মান ও স্বাধীনতা দিয়ে, তাহলে যে শুধু আনন্দেরই উপকার হবে তা নয়, তার নিজেরও ভালো লাগবে।

কিন্তু আনন্দের মনের গতি বোঝে না সে। গাড়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছে ; আনন্দকে বলে—ঘোরাফেরা করো আনন্দদা, যা ভালো লাগে তোমার।

বাড়ীতে নির্দেশ দিয়েছে কেউ যেন আনন্দের ব্যাপারে কথা না বলে।

আসলে আনন্দ বড় ধাক্কা খেয়ে গিয়েছে ভেতরে ভেতরে। কলকাতা তার ভালো লাগত, অনেক সুখস্মৃতি ছিল কলকাতার পরিচিত মানুষগুলোকে ঘিরে—সেইজন্যে সে ভেবেছিল সবই বুঝি তেমনই রয়েছে—শুধু তার ফিরে আসবার অপেক্ষা। সে অসম্ভব কল্পনা তার ভেঙেচুরে গিয়েছে। জীবনেরও দাবি আছে। পাঁচটা বছর ধ'রে জীবন নির্মম হাতে তার দাবি আদায় করেছে, কিছুই আর সেরকম নেই। জগৎসুদ্ধ মানুষ যে-যার কাজে চলেছে, তার মতো

অকেজো একটা মানুষের জন্য তো অটুট সুখসম্ভার নিয়ে কেউ অপেক্ষা করে নেই। বদলে গিয়েছে সব। আর সব থেকে বদলেছে ইন্দু। জীবনে যে সে প্রবঞ্চিত হয়েছে, সেই শূন্যতা-বোধই তাকে দিশাহারা করেছে। পড়াশোনা ভালো লাগে না তার। কোন জিনিসে মন নেই। একটা ধরে একটা ছাড়ে—কেউ কিছু বললে কেঁদেকেটে অভিমান করে অস্থির হয়।

কখনো নিজের গাড়ী বের করে। বলে—চলো, ঘুরে আসি।

সাজসজ্জার বালাই নেই, সাদা কালোপাড়ের বেগমবাহার শাড়ী, কালো ভেলভেটের পুরু-হাতা জামা, হাতে-জড়ানো খোঁপা, পায়ে নাগরা—এতেই রাজেন্দ্রাণীর মতো দেখায় ইন্দুকে।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে কখনো। অনেক কথাই হয় —মহারাজের কথা, বাল্যকালের কথা। বিবাহিত জীবনের কথাও বলে ইন্দু। বলে—শিব দেখা করতে গিয়েছিল, জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলাম, তাতে শিবের যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেল ও-বাড়ীতে। ওরা ভাবল—পাছে শিবকে আমি ওদের কথা বলি। ওরা কাউকে বিশ্বাস করে না, আনন্দদা। নিজের মা-বোনকেও নয়। ওর দাদা ওর মেজদাকে বিষ দিতে গিয়েছিল···বৌ-কে বিশ্বাস করবে কোথা থেকে বলো? অথচ গুরুভক্তি খুব। বছরে আট মাস বাড়ীতে গুরুদেব অধিষ্ঠান হয়ে আছেন। বৌ-মেয়েদের সেবা ছাড়া তাঁর চলে না···সে অনেক কথা, আনন্দদা।

বলে আর অল্প অল্প হাসে। বলে—তুমি জান না, আমাকে দেখে ভেতরে ভেতরে জ্বলে-জ্বলেই বাবা মারা গেলেন।···মেমসায়েবের কথা শুনেছ তো? তার ওপর এতটুকু রাগ নেই আমার। এল যখন, যদি দেখতে! বয়স হবে তিরিশ···ছেলে-মেয়ে ছোট ছোট। বড় আশা করে এসেছে, আসবে আর রানী হয়ে বসবে। সিমলাতে বাড়ী নিয়ে থাকবে,—কাশ্মীরের লেকে বেড়াবে—। ও এল যখন, আমার চলে

আসা সহজ হল। সে-সব কথা থাক। তুমি গান গাও আনন্দদা।

পরের কথা আনন্দেরও ভালো লাগে না। ইন্দুর কথায় গান ধরে—

'আশা ছিল মনে—দোঁহে একসনে কুসুম-মালাটি গাঁথিব,
আশা ছিল মনে—তব হৃদিকোণে প্রেমের আসন পাতিব,
সে সুখস্বপন ভেঙে গেছে মোর
নিশি হল ভোর—ছিন্ন মালা-ডোর—
ভগ্ন আশা নিয়ে চলে যাব প্রিয়ে, আর কভু নাহি আসিব।'

গান শেষ হলে ইন্দু অন্যমনস্কভাবে বলে—জান আনন্দদা···ঠিক চলে আসতে চাইনি। আশা করেছিলাম···

কি যে আশা করেছিল ইন্দু, সে কথা সে কোনদিনও বলতে পারবে না আনন্দকে। আশা করেছিল, জয়শঙ্কর তাকে বুঝবেন। আস্তে আস্তে সব কথা ভুলে যাবে সে। ঈশ্বর আছেন কোথাও, সে বিশ্বাস আর নেই ইন্দুর। স্বামী অযোগ্য জেনেও ভালবাসতে চেষ্টা করেছে সে। এমন নিলাজ আশাও ছিল যে, কোনদিন সে-ও মা হবে। একদিক দিয়ে সম্পূর্ণ হবে তার জীবন।

কিছুই হল না। ইন্দুর সহজাত আভিজাত্য দেখে ছোট বোধ করলেন জয়শঙ্কর। আরো নীচতা করতে বাধলনা তাঁর ব্যবহারে—কথায়-বার্তায়। স্বামীর চেয়ে অনেক নিচু হ'তে আপত্তি ছিল না ইন্দুর। কিন্তু তার বিনয়কে মনে করলেন প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। সবচেয়ে আঘাত পেল ইন্দু, যখন জানলো তার স্বামীর বিবাহিতা স্ত্রী আছে বিলেতে। তার সন্তান আছে। সেদিনই সমস্ত চেষ্টা দিয়ে যতটুকু সেতু গড়েছিল তার আর জয়শঙ্করের মাঝখানে, ভেঙে পড়লো সেটা। কি দেখলো ইন্দু? একটা মিথ্যাকে সত্যি বানাবার চেষ্টা করে বছর-দুটো কাটিয়েছে সে। যা মিথ্যা, তা সহজেই বাতিল

হয়ে গেল। নিজেকে দেখেই ভয় পেল ইন্দু। একি! সে স্ত্রী নয়, মা নয়, বধূ নয়—তবে তার পরিচয় কি? সমস্ত বিফল জীবনটা যেন মরুভূমির বালি। সে বালি পেরিয়ে জীবনের সার্থকতার সবুজে কোনদিনও আসতে পারবে না ইন্দু।

ইন্দু কিছু বললো না। কিন্তু আনন্দ অনেকটা বুঝলো। বুঝে মমতাভরে বললো—তুমি বলবে, তবে আমি বুঝবো? তুমি কি আমার পর ইন্দু? আমি সব বুঝি।

—সব বোঝ আনন্দদা?

—বুঝি।

—গঙ্গা সামনে রেখে বলছ আনন্দদা—মিথ্যেকথা বোলো না যেন!

পরিহাস-ই করতে চেয়েছিল ইন্দু। কিন্তু গলার স্বরটা কেমন যেন ভেঙেচুরে অন্যরকম হয়ে গেল। বিস্মিত আনন্দ বললো—কেঁদনা ইন্দু। তোমাকে কি আমি মিথ্যেকথা বলি? তোমার সব কথা আমি বুঝি।

ভিজে চোখে হাসলো ইন্দু। তার মনে হল অনেকদিন বাদে তার পুরোনো আনন্দদাকে সে পেয়েছে পাশে। একদিন যে আনন্দদা তার কথা শুনে, তার মুখেব দিকে চেয়ে দিনের পর দিন বড় হয়েছে, এ সেই আনন্দদা। মাঝখানে হারিয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে।

আনন্দকে পেয়ে ইন্দুর মনে একটু একটু করে বাঁচবার স্পৃহা ফিরে এল। অনেকদিন বাদে চুল বাঁধতে শুরু করলো যত্ন করে। দাসীদের ডেকে বাগান থেকে ফুল এনে ঘরে রাখলো। উৎসাহ করে দাঁড়িয়ে থেকে মহারাজের ঘর পরিষ্কার করালো।

নিজের প্রসাধনে এল মনোযোগ। পাণ্ডুর গালে একটু একটু করে রং লাগলো।. দেখে সরযূ বড় খুশী হলেন। শিব মা-কে ডেকে বললো—মা, দিদি যা করতে চায়, এতটুকু বাধা দিয়ো না।

আর জোব কবে পুজো-আর্চাতে যেন ভিড়িয়ো না। জানো তো। কোনদিনই সইতে পাবে না।

বয়সে ছোট হলেও শিব-ই এখন দিদিব সব দেখাশোনার ভার নিয়েছে। বাবা থাকলে যা করতেন, তাব কোন ক্রটি যেন না হয়, সেদিকে তার নজব খুব। তাই ইন্দু যখন ডাকলো, তাকে বললো—শিব, আমাকে গান শেখাবে আনন্দদা, তুই ব্যবস্থা কবে দে।

বড় খুশী হল শিব। বললো—তোমাব যা দবকাব সব কবে নাও দিদি, আমাকে বলবাব কি দবকাব ?

গান শিখতে শুরু কবলো ইন্দু বড় শখ কবে। বললো—আব কোন সুব নয় আনন্দদা, বাবাব লেখা সেই গানটা শেখাও তো ?

মহাবাজের লেখা সেই গান। তাব সেই বেকর্ড কবাব কথা মনে পড়লো আনন্দেব।

রিণবিণে কাঁপা-কাঁপা সুবেলা গলা ইন্দুব। 'মনে বেখো সখা এ সুখেব দিন' গাইতে গিয়ে সে-গলায় একদিন কেমন করে যেন কান্না এসে গেল। থেমে গেল ইন্দু। গাইতে গাইতে আনন্দ থেমে গেল বিস্ময়ে। বললো—কি হল ইন্দু ?

—কিছু নয়।

ব'লে উঠে বেবিয়ে গেল ইন্দু। চোখ-মুখ ধুয়ে ফিবে এল একটু বাদে। নাকেব ডগা লাল। বললো—আনন্দদা, একটা কথা।

—কি ইন্দু, বলো ?

মস্ত ঘবখানার আবছায়াতে সবুজ কাঁচেব ছায়ায় কেমন যে ক্লান্ত করুণ দেখাল ইন্দুকে। ইন্দু বললো—এ গানটা আমাব আনন্দদা। এ গান তুমি আর কারও কাছে গেয়ো না।

—গাইব না, ইন্দু।

গান শেখার পাট উঠলো। কিন্তু সেই যে অশান্তিব ভূত চাপলো ইন্দুর ঘাড়ে, তার আর উপশম হল না। ছবি আঁকবার ইচ্ছে হল

ইন্দুর। ঈজেল, রং, ক্যানভাস, তুলি—সব এল। এলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। দু'দিন যেতে-না-যেতেই সব ফেলে দিলো ইন্দু। বললো—এ কি ছেলেখেলা? এ বয়সে আর ওসব হবে না।

জ্যোতিষী এলেন। রত্নলক্ষণ শেখাবেন। কররেখা বিচার করে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে শেখাবেন। ইন্দুর হাত দেখে প্রথমেই তিনি বললেন—তোমার হাতে যে মা অনেক সুখ। পরম সৌভাগ্যবতী তুমি। পতিকুলের গৌরব।

—কি বললেন?

—কি বললাম?

আশ্চর্য হলেন পণ্ডিতমশাই। হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ইন্দু। তীব্রস্বরে বললো—কে আপনাকে ডেকেছে? কিচ্ছু জানেন না আপনি! কে আপনাকে পরিহাস করতে ডেকেছে? চলে যান আপনি।

এ রূঢ়তা ইন্দুর স্বভাববিরোধী। ইন্দুকে দেখে সবাই ভয় পেল। জ্যোতিষীকে অনেক টাকা দিয়ে বিদায় করলেন সরযূ।

নিজের জ্বালা দেখে নিজেই ভয় পেল ইন্দু। আনন্দকে বললো—আনন্দদা, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। এ কি হল বলো তো?

এ কি হল ইন্দুর! এই অস্থিরতা, ছট্‌ফটানি, এ কোথায় ছিল? নিজেকেই ভয় পেতে শুরু করলো ইন্দু। রাতের পর রাত ঘুম হারিয়ে ছট্‌ফটিয়ে বেড়ায়। বিশাল নিদ্রিত প্রাসাদের আঁধার ঘর দিয়ে, বারান্দা দিয়ে—প্রেতিনীর মতো।

কখনো ঘরে গিয়ে আলো জ্বালে। চড়া আলো জ্বেলে দাসীদের বলে—আলমারি খোল্।

হীরে-মুক্তো, চুনি-পান্না প'রে তিনপাল্লার আয়নার সামনে সে দাঁড়ায়। সালঙ্কৃতা রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তাকে ব্যঙ্গ করে।

প্রতিচ্ছায়া বলে—গোটা জীবনটা যার ফাঁকি, তার এতো সাজবার শখ কেন ?

—কি বললি ?

নিজের ছায়াকেই বলে ইন্দু। ব'লে গহনাগুলো টেনে টেনে খোলে। মাটিতে ফেলে। শীত-গ্রীষ্ম পরোয়া না করে ঝর্ণা খুলে দিয়ে স্নান করে।

আবার কখনো একলা গাড়ী নিয়ে বেরোয়। ঘুরে ঘুরে শরীর-মনে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরে অসময়ে।

দেখেশুনে ব্যথা পান সরযূ। মেয়ে এমন হল কেন ? আর আনন্দেব সঙ্গে মেশবার এই দুর্মদ আকাঙ্ক্ষা কেন ? ভয় পান তিনি। বলেন—শান্ত হ' ইন্দু। এমন করে জ্ব'লে বেড়াস না।

—শান্তি দিতে পারো একটু ? না পারো তো মিছিমিছি বোলো না: তোমাব ঐ জপতপ পুজোপাটে কি শান্তির নিশানা আছে ? না থাকে তো ওগুলো নিয়ে পড়ে আছ কেন মা ?

মাকে রূঢ় কথা বলে মেয়েও কাঁদে, মা-ও কাঁদেন। পায়ে পড়ে ক্ষমা চায় ইন্দু। বলে—তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি মা !

দেখে দেখে ব্যথা পায় আনন্দ। ইন্দু তার কাছে গিয়েও এক এক সময় পাগলামি করে। বলে—একটু বিষ এনে দাও আনন্দদা, মবে যাই।

—ছি ইন্দু !

—আত্মহত্যা মহাপাপ তাই না ?

বলতে বলতে হাসতে থাকে ইন্দু। হাসে অস্থির হয়ে—বড় ভয়ঙ্কর সে-হাসি। চোখে দেখা যায় না। হাসে আর বলে—শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তিলে তিলে মারো মানুষকে, সে পাপ নয় ! অথচ জীবনটা মরার বেশী হল যার কাছে, সে যদি মুক্তি পেতে চায়, সেটা হবে পাপ ? এ বড় আশ্চর্য কথা।

আবার হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—আমি নিশ্চয় জানি আনন্দদা, এর চেয়ে আত্মহত্যার পর পরলোক আরো নিদারুণ হতে পারে না। আমি নিশ্চয় জানি।

আবার কখনো আসে বালিকার মতো। বলে—তোমার মুখের একটা কথার জন্যে ঘুরে ঘুরে আসি—কিছু বলতে পারো না আনন্দদা ?

সান্ত্বনা দিতে জানে না আনন্দ। বলে—কিছু একটা করো ইন্দু। একেবারে নিরবলম্ব হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে ?

—কি করব বলো, বলে দিতে পার ?

—কাজ করো···

—কি কাজ ? বাজে কথা বোলো না, আনন্দদা। রক্তমাংসের মানুষ একটা, তাকে হাত-পা বেঁধে রেখেছ, শুধু বলো—কাজ আর কাজ !

যদিও কথাগুলো ইন্দু তাকেই শোনায়, তবু সে যে নিমিত্ত মাত্র এখানে, সে বিষয়ে আনন্দ নিঃসন্দেহ। এ মেয়েকে সে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। এর বোঝাপড়া নিজের সঙ্গেই।

বুঝেও যেন বোঝেনা ইন্দু। আনন্দের কাছে বার বার অকারণ আসে। একদিন একসাথে বসে আনন্দের রেকর্ডখানা শুনতে শুনতে চোখ অশ্রুতে টলটল করে উঠল ইন্দুর। চকিতে ঘর ছেড়ে উঠে গেল। পিছনে এল আনন্দ। বললো—কি হল ইন্দু ?

—কিছু নয়।

বিমূঢ় আনন্দ দাঁড়িয়ে রইল। এই ক'টা কথায় যেন ইন্দুর মনখানার ছবি সে স্পষ্ট দেখতে পেল।

দুটো সৃষ্টিছাড়া মানুষ সমাজ সংসার উপেক্ষা করে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। তা বলে তো সমাজ-সংসার চুপ করে থাকবে না। অদৃষ্টপূর্ব আচার-ব্যবহার ইন্দুর। আনন্দের সঙ্গে মেলামেশাটা আর সকলের

সঙ্গে সরযূরও চোখে লাগে। ধর্ম-কর্ম ভালবাসতেন, স্বামী সেই পথই পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। মাঝখান থেকে মেয়েকে নিয়ে তাঁর যত জ্বালা। অন্নদাত্রীর বিরুদ্ধে কানাঘুষা করাটা দুঃসাহস জেনেও চুপি-চুপি কথাবার্তা চলে। হাজার হলেও দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই যাঁর জপে তপে কাটে, তাঁর পক্ষে তো নিজে সব দেখা সম্ভব নয়। কর্তব্যপরায়ণা দু-একজন আশ্রিতা শ্বেতপাথরের পুজোর ঘরে কথাটা পৌঁছে দেন। শুনে সরযূ তৎক্ষণাৎ তাঁদের রাজবাড়ী থেকে বিদায় করে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন। অসময়ে যান মেয়ের মহলে। দোর বন্ধ করে দিয়ে মেয়েকে ডেকে তোলেন দিবানিদ্রা থেকে। কথাবার্তা যা হয় তা নিচু গলায়। কিন্তু খণ্ডপ্রলয় একটা হয়ে যায় নিশ্চয়।

চোখে প্রতিবাদের আগুন নিয়ে কঠিন মুখে বেরিয়ে আসে ইন্দু। আনন্দকে খবর পাঠায় সন্ধ্যাবেলা যেন তৈরি থাকে। বেরোতে হবে।

গড়ের মাঠে সতরঞ্চি পেতে দিয়ে সরে যায় দারোয়ান। পাশাপাশি বসে আনন্দ আর ইন্দু। গড়ের মাঠে এমন করে এত্তেলা দিয়ে ডেকে আনবার কি তাৎপর্য থাকতে পারে, বোঝে না আনন্দ। বিনা ভূমিকাতেই কথা শুরু করে ইন্দু। বলে—এখানে আর থাকব না। চলে যাব দার্জিলিং বা পুরী। সেখানেই থাকব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

আমি তোমার সঙ্গে যাব ?— পুনরুক্তি করা ছাড়া জবাব খুঁজে পায়না আনন্দ।

—যাবে না ?

—কি বলছ ইন্দু, তোমার সমাজ নেই, সংসার নেই ?

—সমাজ ? সংসার ?···কণ্ঠে বিদ্রূপের বদলে হাহাকার ফুটে ওঠে ইন্দুর। বলে—আমার কি পরিচয় দিয়েছে তোমাদের সমাজ ? আমি

স্ত্রী নই, মা নই, সধবা নই, বিধবা নই—জোর করে আমাকে পরিচয়-হারা করেছে সবাই। তোমারই বা কি সমাজ আছে বলো? সমাজ-সংসার ছাড়া হয়ে যদি চলেই যেতে পারি আমরা···বলো আনন্দদা, একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে?

—ইন্দু!

আনন্দের হাঁটুতে মাথা রেখে কেঁদে ফেলে ইন্দু। বলে—আমি আমাকে নিয়ে একা-একা আর পারি না—আনন্দদা···তুমি বিশ্বাস করো।

গভীর স্নেহে সান্ত্বনা দেয় আনন্দ। বলে—তুমি তো জান না ইন্দু, তুমি কি বলছ। নিন্দা, কলঙ্ক আর অপযশ, সে কি তুমি সইতে পারবে? আজ মনে হচ্ছে পারবে, কিন্তু সে-দিন সত্যিই পারবে না। জীবনেও তো অপমান সহ্য করনি ইন্দু।

—তুমি পারবে না তাই বলো।

—হ্যাঁ ইন্দু, সে কথাও সত্যি। আমিও পারব না। দু'দিন পরে তুমি আমায় দোষ দেবে, আমি তোমার ওপর রাগ করব·· কি হবে বলো সেধে দুঃখ ডেকে এনে?

চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসে ইন্দু। বলে—তবে কতকগুলো কথা বলি তোমাকে, বাধা দিয়োনা। আর তো বলতে আসব না। তুমি ফিরে যাও, আনন্দদা। ফিরে যাও এইজন্যে বলি যে, তুমি থাকলে মন আমার আরো অশান্ত হবে। বারোবছরের চেনা-জানা মন—তাতে বড় দাগা দিয়ে চলে গিয়েছিলে তুমি। দয়ামায়া তো তোমার নেই! যা হোক, সে মন নিয়ে সকলেই পুতুল-খেলা খেললো। আবার কেন ঘুরে এলে তুমি? চোখের সামনে এলে—অসম্ভব আশায় মন উতলা হল···না না আনন্দদা, তুমি ফিরে যাও। আমি খুব বিশ্বাস করি, তোমার এ অবস্থা তুমি-ই করেছ···তোমাকে সে সত্যিই ভালবাসে।

—ইন্দু !

—আর তুমিও তাকেই ভালবাস। বোধ হয় সে কথা নিজেও জান না।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ইন্দু ধীরে ধীরে বলে—শুধু একটা কথা আনন্দদা, এমনি করে শুধু ভেঙে ভেঙে দিয়ো না। যে তোমায় ভালবাসে তাকে একটু বুঝতে চেষ্টা কোরো, দেখো খুব সহজ হয়ে যাবে।

গভীর শ্রদ্ধায় আনন্দ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—ইন্দু, তুমি আমায় ক্ষমা করো !

—'ক্ষমা ?' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে একটা। তারপর ক্ষীণ চাঁদের মতো পাণ্ডুর হাসে ইন্দু। বলে—বরং তুমিই আমায় মাপ করো। কত কথা বললাম !···আর তো দেখা হবে না।

—সে কি কথা ইন্দু ?

—না আনন্দদা। আর নয়। আমি জানি। আর মিছামিছি দেখা করেই বা কি হবে বলো—তাব থেকে যে যার জীবন নিয়ে থাকি ···কেটে যাবে। কে কাকে মনে রাখে বলো ?

উঠে দাঁড়ায় দুজনে। চার্চের ঘড়িতে রাত দশটা বাজে।

ইন্দুর কথাতে নিজের মনের নির্দেশই খুঁজে পায় আনন্দ। পরদিন-ই ভোরের ট্রেন ধরে।

বাহারের জন্যে মনে এমন তীব্র পিপাসা জাগে যে, অবাক হয়ে যায় আনন্দ। একমাস নয়, যেন এক যুগ নির্বাসনের পর ফিরছে সে। পাঁচ বছরের সুখে দুঃখে অভ্যাসে সে মেয়ে এতখানি জড়িয়ে গিয়েছে তার জীবনে, সে কথাই কি আনন্দ আগে বুঝেছিল ? শুধু ভুল করেছে আর ভুল বুঝেছে আনন্দ। ভুলের বোঝা নামিয়ে দেবার যে একটা ঠাঁই আছে, এটাই তো মস্ত লাভ। একজন মানুষ আছে, যার কাছে

তার কোন ভান করবার দরকার নেই, যে তাকে দেখেছে দোষে গুণে ত্রুটি-বিচ্যুতিতে। একটা আদর্শকে ভালবাসা যায়। রক্তমাংসের মানুষকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ভালবাসবার মধ্যে আছে ত্যাগ ও দুঃখ। তাকে যদি কেউ সত্যি চায়, তো সে বাহার-ই।

অথচ এই কথাটা বুঝতেই তার দেরি হয়ে গিয়েছে। ইন্দুর কথা মনে করে কতকগুলো রেখা পড়ে আনন্দের মুখে। অনেক কথা উঠবে জেনেও ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছে ইন্দু। শিবকেও বুঝিয়েছে সে-ই। আমার কোন দাবি নেই?—ব'লে শিব তার ক্ষোভ জানিয়েছে। তাকেও বুঝিয়েছে ইন্দু।

পথে সাবধানে চলবার উপদেশ-ই দিয়েছে ইন্দু। গাড়ী ছাড়বার আগে যখন ঘণ্টা পড়ল, তখন নেমে দাঁড়াল। জানালায় দাঁড়িয়ে বললো—আবার বলি, যদি অন্যায় বলে থাকি কিছু, মাপ কোরো। আনন্দ বলেছিল—তুমিও কিছু একটা কোরো ইন্দু। এমনি ভাবে থাকলে মরে যাবে।

করুণ ও মধুর হেসেছিল ইন্দু। বলেছিল—তাই করব। শ্রীনটপুরের মেয়ে আর নন্দনগরের বৌ-রানী, এ দুটো পরিচয় ছাড়াই নিজের নামে বাঁচতে চেষ্টা করবো এবার। তা ছাড়া তো উপায় নেই। তবে সন্ধান যা করবো তা ইহলোকেই, পরমার্থের সাধনা আমার পোষাবে না।

দিদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল শিব। প্ল্যাটফর্ম-ভরা মানুষজনের ব্যস্ততা, ট্রেন ছাড়বার তাড়াহুড়ো—তারই মধ্যে ইন্দুকে এমন নিঃসঙ্গ দেখিয়েছিল যে, মনে করতেই আনন্দের চোখটা সহানুভূতিতে জ্বালা করে উঠল। বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল দৃষ্টি। আকাশ-নীল রেশমের শাড়ীর অবগুণ্ঠনে পাণ্ডুর দেখাচ্ছে মুখখানা, সেই রঙেরই পুরু-হাতা জামা গায়ে, কালো চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ—ইন্দুকে দেখে আনন্দের মনে হয়েছিল কোলাহলের সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মূর্তিমতী

নিঃসঙ্গ-বেদনা। দূর থেকে দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে—ইন্দু তাকিয়েই ছিল। কাঁধে হাত দিয়ে শিব তার মুখ ফিরিয়ে নিল।

উধাও হয়ে চলেছে ট্রেন। জানালার কাঁচে নিজের ছায়াখানা উঠছে আর নামছে। শীর্ণ ও রেখান্বিত মুখ, চোখের নিচে কালি ঢালা, পাঞ্জাবি ও যোধপুরী পরনে, নাগরা পায়ে—এই মানুষটাকে কি আনন্দ চেনে? এই কি সেই আনন্দ, যে অনেকদিন আগে আগ্রার এক খাস-জলসায় বসে জমির খাঁ সাহেবের ঘরানার পুরববাজি তান-তরকীব জাহির করে নাম কিনেছিল? ফল্গুর বালির চরে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় এরই হাত ধরে মিনতি করে এক রূপসী মেয়ে বলেছিল—তোমাকে ছাড়া মানে, আমার জীবনটারই মানে হারিয়ে যাওয়া, বোঝ না কেন? আমি মানুষ···আমার ভুল-ত্রুটি হবে না?

নিজের ছবিখানা দেখতে দেখতে পরম ক্লান্তিতে চোখ বুঁজল আনন্দ। গন্তব্যস্থান আরো তাড়াতাড়ি কাছে আসুক। কাছে আসুক বাহার।

সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে যায় গয়া। একা চলে নির্জন পথ দিয়ে। ভাবনা নেই চিন্তা নেই, আছে শুধু ক্লান্তি।

আঁধার বাড়ীখানা। সাড়া পেয়ে উঠে আসে মালী। সেলাম জানায়। বলে—তারা কেউ নেই।

—নেই? কোথায় গেছে? কবে গেছে?

—বাঈ আগে গেছেন, পরে বাবু গেছেন। আপনাকে বেনারস যেতে বলে গিয়েছেন।

আশাভঙ্গে রাগ হয় বাহারের ওপর। সেই এক্কা-ই ধরে স্টেশনে ফেরে আনন্দ।

বেনারস পৌঁছয় ভোরবেলা। টাঙ্গা নিয়ে বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে সাতটা বাজে। বাদল করেছে সকাল থেকে। পাথরের টালিগুলো জলে

চকচক করছে। বাড়ীতে পৌঁছে আর ধৈর্য মানে না আনন্দের। ছুটো-চারটে করে সিঁড়ি টপ্‌কে ওঠে। ডাকে—বাহার!

সাড়া মেলে না। এ-ঘরে নেই ও-ঘরে নেই, সকালবেলাই কোথায় গেল বাহার? শোবার ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ে আনন্দ। বন্ধ ঘর। বন্ধ হাওয়া। কতদিন কেউ ঢোকেনি ঘরে। বিছানা পড়ে আছে। কবেকার শুকনো মালা একটা শুকোচ্ছে দেয়ালে। কি হয়েছে? ভাবতে পারে না আনন্দ। বিস্ময় পরিণত হয় আশঙ্কায়। চীৎকার করে ডাকে আনন্দ—বাহার! বাহার!

ত্রস্তে ঘরে ঢোকে মোহন। —ওস্তাদ! দোস্ত! কণ্ঠে তার বিস্ময়।

—বাহার কই মোহন?

আনন্দকে হাত ধরে বসায় মোহন। বলে—বোসো, বলছি।

অস্থির হয়ে ওঠে আনন্দ—কি বলবে তুমি? কি হয়েছে? বাহার কোথায়?

—বাহার নেই, আনন্দ।

—বাহার নেই!

মূঢ় হয়ে যায় আনন্দ। মোহন ত্রস্তে বলে—না-না, খারাপ কিছু নয়। তুমি কলকাতা গিয়েছ যে-রাতে সেই রাত-ভোরেই চলে গিয়েছে বাহার। কোথায় গিয়েছে জানি না। চিঠি লিখে গিয়েছে তোমায়।

—কোথায় চিঠি?

খাম বের করে দেয় মোহন। বলে—সেদিন থেকে নিয়ে বেড়াচ্ছি সাথে সাথে। আমাকে দিয়ে গিয়েছে চৌকিদারের কাজ, আর আমি বসে আছি এই বাড়ী ধরে।

চিঠিখানা খুলে ফেলে আনন্দ। পড়ে—

এমন একদিন ছিল যেদিন ভাবতাম, যা ইচ্ছে করবো, তাই করতে পারবো। ভ্রান্ত ছিল আমার আত্মবিশ্বাস। তারই ভরসায় তোমাকে জোর করে আমার

জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছিলাম। ভুল করেছি। জোর করে আর যাই হোক, মন বাঁধা যায় না।

সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত আজ করছি। পাঁচ বছর ধরে এমন একটা মুহূর্তের আশা করে বসে ছিলাম, যখন আমার মুখের দিকে চেয়ে কি সাদা চোখে, কি রঙীন চোখে সত্যিকারের 'আমি'-কে দেখতে পাবে। সে-দিন এল না।

আজ তাই তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে তোমার যে লড়াই, তার মাঝখানে পড়ে আর টুকরো হতে চাই না। আমাকে তুমি মাপ কোরো।

শুধু একটা কথা বুঝলে না তুমি, যে আমি মেয়ে। চেষ্টায় আমার আন্তরিকতা ছিল। ভ্রান্তি ছিল পন্থায়। তাই দিন দিন তুমি বেড়ে উঠবে, সূর্য হয়ে নিষ্প্রভ করে দেবে অন্যদের ; তা নয়,—কেমন করে নিভে গেলে, ছোট হয়ে গেলে। নিশ্চয় আমার পাপে।

তাই তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। আর কোনদিন তোমার পায়ের শেকল হতে আসব না। ভেবো না, ছেড়ে যেতে ভালো লাগছে আমার। কষ্ট হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে, দুনিয়াটা চোখের সামনে খালি হয়ে যাচ্ছে—তবু ছেড়ে যাচ্ছি। আমার দুঃখতে যদি দুনিয়ার সব মেয়ের মনেব দুঃখ মিটত, আনন্দ !

এ ছাড়া আর কোন্ পন্থা ছিল বলো ! —বাহার

বেলা গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর থেকে বিকেল হল, চিঠিখানা নিয়ে পাথর হয়ে বাহারের খাটে বসে রইল আনন্দ। ঝড়-খাওয়া বনস্পতির মতো বিধ্বস্ত ও বিস্রস্ত চেহারা। স্নান-খাওয়ার কথা দু-একবার বলে সরে পড়ল মোহন।

সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল যখন, তখন দেশলাই ঠুকে মোমবাতি জ্বালালো আনন্দ। শূন্য ঘরখানা তাকে উপহাস করছে। সমস্ত পথ অতিক্রম করে যখন বাহারের কাছে ফিরে এসেছে আনন্দ, তখনই চলে গেল বাহার। এ কি হল ?

ঠিক হয়েছে। এই শাস্তি-ই তার পাওনা ছিল। এত সুলভে সুখ পাওয়া যাবে, এ কথা ভাবাই তো তার ভুল হয়ে গিয়েছে। প্রেমও

অর্জন করতে হয়। বিশেষ করে বাহারের প্রেম। কি দাম দিয়েছে সে? কোন্ স্পর্ধায় আশা করেছিল আনন্দ, যে বসে থাকবে বাহার তার জন্য?

বুক মন্থন করে হাহাকার উঠে অশ্রুহীন বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ল। বাহারের বালিশে মুখ গুঁজে আহত একটা মস্ত জন্তুর মতো কেঁদে উঠল আনন্দ। মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

রাত বেড়েছে। রাতের বেনারসের জীবনগুঞ্জন কিছু কিছু কানে আসছে। মোমবাতিটা ধরে ঘরখানা দেখতে লাগল আনন্দ। মোমবাতির আলোয় তার ছায়াখানা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ধুলো পড়েছে বিছানায়। ধুলো পড়েছে চৌকির ওপরের তানপুরায়, পাখোয়াজে, হারমোনিয়মের বাক্সে। চামড়ার পেটিতে গাঁথা ঘুঙুর-জোড়া দেয়ালের গায়ে ঝুলছে, টেবিলে বাহারের প্রসাধনের জিনিসগুলো। আয়নার ওপর মাকড়সা জাল বুনছে। আয়নার সামনে খালি ফোটোর ফ্রেম।

ঘরখানার মতো হৃদয়েও জাগে মহাশূন্যতা। সব ভাঙা জোড়া লেগে যেত, সব ভুল ঠিক করে নেওয়া যেত, যদি ঘরে থাকত বাহার। কতদিনের কত ভুল, অপরাধ হাসিমুখে ক্ষমা করেছে সে, অশ্রুমোচনের ইতিকথা রাতের গোপনে রেখে, প্রতি প্রভাতেই নতুন করে আশার বাণী শুনিয়েছে। তার প্রাণঢালা চেষ্টায় যে আজ মরুতে ফুল ফুটেছে, পাষাণ হয়েছে শস্যশ্যামল, বিমুখ হৃদয়ে প্রেম এসেছে—দেখতে অপেক্ষা করে রইল না বাহার?

তোমাকে যে চাই, সে-কথা বোঝবার জন্যেই দূরে যেতে হয়েছিল, তুমি ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই। সমস্ত দুনিয়া থেকে গুটিয়ে নিয়ে এলাম বিবাগী মন, ভিখারী হয়ে এলাম তোমার দরজায়, বলো এখন আবার কেন বিবাগী করলে?

অন্তরের হাহাকার যেন কথা ক'য়ে ওঠে শূন্য ঘরের দেয়াল থেকে। কতকগুলো কালো-কালো ছায়া তাকে বিদ্রূপ করে। মন বলে, সব

ছেড়ে চলে যাও। বড় শুভলগ্ন সমাগত তোমার জীবনে—এতখানি মুক্তি তুমি কখনো পাবে না।

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত সাড়া দেয় সে-সঙ্কেতে। আর এতটুকু দেরি করা চলবে না।

দরজার সামনে ঘুমোচ্ছে বিশ্বাসী বন্ধু মোহন। তাকে ডেকে তোলে না আনন্দ। মনে হয় যদি বাধা দেয়। কোথায় যাবে সে-কথা ভাবে না। সঙ্গে কিছু নেবার কথাও মনে হয় না তার। ছোট একটা চামড়ার ব্যাগে যা ধরে ভ'রে নেয় তাড়াতাড়ি।

মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয়। সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে মোহনের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসে। বাড়ীটা প্রেতপুরীর মতো নিঃশব্দ। সঙ্কীর্ণ পাথরের সিঁড়ি ধরে নেমে আসে আনন্দ। বেরিয়ে যায় পাথরের রাস্তা ধরে। তার পায়ের শব্দটা মিলিয়ে যায়।

ক্লান্ত ঘুমের মধ্যেই দরজাটার ধড়াস কবে বন্ধ হবার আওয়াজ শুনে চম্‌কে উঠেছিল মোহন। তারপর সব নিঝুম হয়ে গেল। সব ঠিক আছে ভেবে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙে গায়ে জলের ঝাপটা লাগতে। বাতাসের সঙ্গে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি ঘরখানাতে জোয়ার ভাসিয়ে এনেছে। আনন্দ কোথায় গেল ?

আশঙ্কার চাবুক লাগে মনে। উঠে পড়ে মোহন। দরজাটা আপনা থেকেই খুলে গিয়েছে। শূন্য ঘর। আনন্দ নেই। তার জিনিসপত্রও নেই।

দরজার দুপাশে দুখানা হাত রেখে দাঁড়িয়ে মোহন বোঝবার চেষ্টা করে ব্যাপারখানা।

ঝোড়ো বাতাসে দরজা-জানালাগুলো ধড়াস ধড়াস করে পড়ে। বৃষ্টির ছাটে ঘর-দোর ভেসে যায়।

॥ এগারো ॥

গয়া থেকে রাজগীর, রাজগীর থেকে সাসারাম হয়ে বেনারসে ফিরল বাহার। ভাঙা মন নিয়ে ঘরে ফিরতে ভালো লাগবে না, এই মনে হয়েছিল তার। তার পর দেখল, সে ধারণার কোন মানে নেই। আসলে ঘর-বাহির দুই-ই তার কাছে সমান। বরঞ্চ ভেসে ভেসে বেড়ানোতে ক্লান্তি আছে, তার চেয়ে নিজের ঘর-ই ভালো। বেনারস তার নিজের শহর, জন্ম থেকে চেনা-জানা। সেখানে সে তবু একলা থাকতে পারে নির্ভয়ে। অন্যত্র তা সম্ভব নয়। বয়স, যৌবন, রূপ সবই তার শত্রু। নিজের কাছে নিজের মূল্য আজ আর সে রূপ-যৌবন দিয়ে মাপে না, কিন্তু দুনিয়া তো তার বিচার মানে না। তাকে নিয়ে নতুন করে কোন সমস্যা যদি হয়, ভেবেই ভয় পায় বাহার।

নীরবে চলে গিয়েছিল একদিন, আবার নীরবেই ফিরে আসে বাহার। তার দুঃখও যেমন বৃহৎ, সে দুঃখ বহন করতে করতে তার ব্যক্তিত্বও হয়ে উঠেছে উপযোগী। গভীর ও অন্তর্মুখী হয়েছে মন। চোখে নেমেছে প্রশান্তি। কথা হয়েছে মৃদু। তাই মোহনকে বলার কথা ফুরিয়ে গিয়েছে, কোন কৈফিয়ত-ই দেয় না বাহার। টানা-পোড়েনের মাঝখানে প'ড়ে বয়সটা বড় বেড়ে গিয়েছে মোহনের। কোন কিছু জানবার আগ্রহ সে প্রকাশ করে না।

ঘরটা খুলে যখন বসে বাহার, তখনই মোহন বলে—তোমার খোঁজে আনন্দ ফিরে এসেছিল জান ?

—আমার খোঁজে ?

বাহারের কণ্ঠের ক্লান্ত অনাসক্তি লক্ষ্য করে না মোহন। বলে—তোমার কাছেই ফিরে এসেছিল সে। তুমি আছ জেনে বড় আশা

করে এসেছিল সে। এল যখন, তখন তুমি নেই। তারপর তোমার চিঠিখানা দিলাম। পুরো দিন-রাত পড়ে থাকল তোমার বিছানায়, মুখ গুঁজে। কিছু খেল না, উঠল না। জেগে থাকব ভেবেছিলাম, কোথা থেকে এল চোরা ঘুম। জেগে দেখলাম ঘরে মানুষ নেই।

অপ্রত্যাশিত এই পরিণতির কথা শুনে চেয়ে থাকে বাহার। অবসন্ন কণ্ঠে বলে—তার পর ?

বিড়ি ধরায় মোহন। আত্মগত ভাবেই বলে—তারপর থেকে ঘর ধরে বসে আছি একমাস। বেনারস, মোগলসরাই, সারনাথের কোথাও দেখতে বাকি রাখিনি। পাত্তা নেই তার। আমাকে তো তোমরা কয়েদে রেখে গিয়েছ, ঘর ছেড়ে যেতে পারি না, নইলে দেখতাম অন্যত্র। আর দেখেই বা কি হবে। ফিরবে বলে তো যায়নি। ফিরবে না, বলেই গিয়েছে। ভালোই করেছে। কোথা থেকে এসেছিল তা-ও জানি না। পথঘাট থেকেই উঠে এসেছিল, পথের মানুষ আবাব পথে বে-পাত্তা হয়ে গিয়েছে। তা গিয়েছে যাক্। মাঝখান থেকে আমাকেও কেন বরবাদ করে রেখে গেল ?

ধুলোর ওপরেই বসে বাহার। বলে—কি হবে মোহন ?

হাতখানা হতাশার ভঙ্গীতে চিৎ করে মোহন। বলে—লাহোরে বৈশাখী মেলায় বসন্ত হয়ে মরছিলাম, তুলে এনে জান বাঁচিয়েছিলে তুমি। সে ঋণ শোধ করতে জানটাই লিখে দিলাম তোমাদের জন্যে —এখন আমায় ছুটি দাও, বাহার ! চলে যাই।

—আমি কি করব ?

—কোনদিন একটা কথাও কি শুনেছ, যে আজ আমি ভরসা করে বলব ? তবে একটা কথা বলি—মেয়ে হয়ে জন্মেছ, অনেক নরম হওয়া উচিত ছিল। তাকে শান্তি দেওয়া উচিত ছিল। তার জন্যে বসে থাকা উচিত ছিল। তুমি যদি থাকতে বা তুমি আসবে বলে যদি জানত, সে কখনো চলে যেত বাহার ?

জবাব নেই। কপালে হাত ঠেকায় বাহার। বলে—আমার নসীব।

—তোমাকে আমি দোষ দিই না। ভুল করেছ, তার শাস্তিতেও তো তুমিই জ্বলে মরছ। বলো—আমার আর কি! তবে এ হিসেব-নিকেশের ফয়সালা করতে পারতে চিরজীবন ধরে। মাঝখান থেকে একটা মানুষের মতো মানুষ বরবাদ হয়ে হারিয়ে গেল—আফসোস! …এত জ্বালা, এত মান-অপমান বোধ, এত চাহিদা…মেয়েদের কি তা মানায় বাহার? স্নিগ্ধ হবে, শান্ত হবে—তবে না মেয়ের মতো মেয়ে?

…একবার এসেছিল, আবার যদি আসে? ভেবে ভেবে দুরাশায় বুক বাঁধল বাহার। বহুদিনের আবর্জনা পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে ফেললো বাড়ীখানা। সে কাজে ক'টা দিন গেল। অব্যবহারে মলিন বিছানাপত্র, বাসন-কোসন, আসবাব, গৃহালঙ্কার পরিষ্কার করে জৌলুষ ফেরাতে গেল কতদিন। বাহার ফিরেছে বেনারসে। আনন্দ সঙ্গে নেই, এ কথা জেনে নিছক কৌতূহলে দেখতে এল কত জন, শুধু বাহারের খাতিরে এল কত জন, কারুকেই অনাদর করল না বাহার। বসাল সযত্নে। করজোড়ে জানাল ওস্তাদ এখানে নেই, তিনি ফিরে এলে পুরোনোদিনের মতো আমন্ত্রণ যাবে পুরোনোদিনের অতিথি-অভ্যাগত মহলে।

—ফের আসবেন ওস্তাদ? কবে?

শ্রোতাদের সবিস্ময় প্রশ্নের জবাবে বাহার স্মিত বিনয়ে জানায়—শীঘ্রই আসবে আনন্দ।

নিরাশ হয়ে ঘরে ফেরে শ্রোতারা। পরস্পরকে জানান দেয়—কলকাতাওয়ালা গাওয়াইয়া জাদু করেছে বাহারকে। ওই এক ধ্যান করতে-করতেই শেষ হয়ে গেছে মেয়েটা। ওকে দিয়ে আর কিছু হবে না।

সমাগমে ভাঁটা পড়ে। তাতে বাহারের দুঃখ নেই। বরঞ্চ সময় পেয়ে ভালোই হয় তার। কখনো মোহনের সঙ্গে, কখনো একলা ঘাটে ঘাটে অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে ফেরে।

শরৎ কেটে শীত এসেছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে নামে অপূর্ব মায়াময় সন্ধ্যা। নতুন কুয়াশায় কি যেন মায়া আছে। পরিচিত শহরটার কুশ্রীতা ও দৈন্য অনেকখানি তাতে ঢাকা পড়ে। বড় ছায়ার নিচে বসে কথকঠাকুর আজও গান করেন—শীতবস্ত্র জড়িয়ে বসে শোনবার মানুষ শুধু কমে এসেছে।

শালের গুণ্ঠনে শীত নিবারণ করে বসে ছিল বাহার। রাতের কুয়াশা জলের ওপরে জমে পরিবেশকে করেছে রহস্যময়। নৌকোর আলোগুলোকে মনে হচ্ছে রাতের গায়ের বেনারসী চুম্‌কি। এই চিরপরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে বাহারের মনটা ভরে ওঠে এক কোমল মমতায়।

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল···'

পদকর্তার গানের আকৃতি এই সন্ধ্যাকে আরো মায়াময় করে তোলে। গালে হাত দিয়ে বসে গান শুনতে-শুনতে আঁখিতে নামে সমবেদনার ছায়া।

এমনি সময় সিঁড়ি ধরে এসে নামে সুরতিয়া। বাহারকে দেখে বলে—হায় পরমেশ্বর! এখানে বসে আছ তুমি···একবার বাড়ী চলো। খুঁজছে তোমায় মোহন সাব।

বাড়ীতে ফিরে বাহার দেখে, মোহন উত্তেজিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। বাহারকে দেখেই বলে—কোথায় ছিলে বাহার? খোঁজ পেয়েছি আনন্দের। পুষ্কর-তীর্থে গিয়েছিল মেওয়ালাল, ফেরার পথে আগ্রাতে গান শুনে এসেছে তার। বলে—ভৈরবীর জলসা বসেছিল নরসীপ্রসাদের ফুলবাড়ীতে। বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হয়ে গান করেছে

আনন্দ। সে চেহারা নেই, সে শরীর নেই। তিনঘণ্টা গানের শেষে যখন জমায়েৎ সপেরার হাতে সাপের মতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, তখনই সরে পড়েছে আনন্দ। সেদিন পুরো আগ্রা তালাস করেও তার সন্ধান মেলেনি। শোনা গেছে, সে এমনি করেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে আজ কয়মাস। মেওয়ালালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এক লহমার জন্যে। বলেছে সে এমনি করেই বেড়াবে। আর কোনও কথা হয়নি।

—কতদিন হল দেখা হয়েছে?

—তা একমাস হল।

তবে আর কেমন করে তাকে ধরবে মোহন? ঘরে চলে যায় বাহার। জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল-ভাবে। ভেবে ভেবে কূল পায় না বাহার।

রাতভোর জেগে তার পরদিন মোহনকে ডাকে। বলে—তা-ই ঠিক করলাম—তা-ই ভালো।

—কি ভালো?···বিস্মিত হয় মোহন। বাহার বলে—তীর্থে তীর্থে যাব, মোহন।

মোহনের মুখের দিকে না তাকিয়েই সকরুণ হাসে বাহার। বলে—এখানে থেকে আর কি হবে বলো? কোন লাভ আছে? তোমায় আমি যেতে বলি না। আমি ফিরব কি ফিরব না, তার-ই ঠিক নেই, তোমাকে মিছামিছি জড়াব কেন বলো।

সস্নেহে মোহন বলে—তুমি চাও না-চাও, আমি তো তোমায় একলা যেতে দেব না। চলো একসঙ্গেই যাই।···বাড়ীঘরের কি করবে?

—ব্যবস্থা করো। সব রেখে চলো নেকলালের কাছে। বলো যে, ফিরতে আমাদের ছয়মাস থেকে একবছরও হ'তে পারে।

তা-ই ঠিক হয়। গহনাগুলি বেচে দেয় বাহার। বলে—

হীরে-মুক্তো নিয়ে কি করবো মোহন—টাকা নিয়ে নাও, যা পারো।

হাজারটা প্রয়োজনীয় জিনিসকে অপ্রয়োজনীয় ব'লে দিয়ে দেয় সুরতিয়ার কাছে। ঘরে ঘরে তালাবন্ধ করে। অনেক কিছুই বেচে দেয় বাহার নেকলালের গদীতে। বাড়ী বন্ধ করে চাবি দেয় সেখানে।

এলাহাবাদের টিকিট করে গাড়ীতে বসে দুজনে। মোহন বলে —হারমোনিয়ামটা নিয়ে এলাম, বাহার।

—কেন ?

—বাজাব মাঝে মধ্যে।

মিষ্টি হাসে বাহার। তার পর গাড়ীর জানালায় মাথা রেখে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

॥ বারো ॥

মথুরার ঘাটে বসে গান গাইতে গাইতে সেদিন আপনি-ই চোখের জলে গাল ভেসে গেল আনন্দর। করজোড়ে প্রণাম করলো। তারপর বসে রইলো চুপ ক'রে।

শ্রোতাদের একটি দল এতক্ষণ সশ্রদ্ধে বসে ছিল একটু দূরে। এবার উঠে পড়লো তারা। একজন বললো—আর গাইবেন না আজ ?

ঘাটের পূজারী ঘাড় নাড়লো। বললো—আজ দশদিন ধরে দেখছি এখানে। সন্ধ্যে-সকালে আপন মনে গান করেন। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। কিছু চান না। বড় ভক্ত মানুষ সাধুজী।

—উনি সাধু ?

—সাধু কি বাবুজী গেরুয়া আর কপ্‌নিতে হয় ? উনি সাঁচ্চা সাধু।

ঘাট থেকে একটু দূরে এসে পরিত্যক্ত একটা ঝোপ্ড়ির ধারে বসলো আনন্দ। আজ গান শুরু করতে-না-করতে মন ভরে গেল তার। আজ আর গান গাইতে হবে না।

দেড় বছর আগে যখন কাশী ছেড়ে এল আনন্দ, তখন পথ চলতে চলতে এমনিই এসেছিল আগ্রা। একজন পথিকৃৎ গেয়ে অমর করেছেন যে গান, সেই ভৈরবী ঠুংরী 'যমুনা-কী তীর' গেয়েছিল আনন্দ। গান গাইবে বলে যে এসেছে ছুনিয়াতে, সে কেন গানের অন্তরের যে গান, সঙ্গীতের যে অমর আত্মা তার সন্ধান পায় না ? সেই সন্ধানের কথাটি মনে নিয়েই গাইতে বসে আনন্দ। গানের শুরুতে ছিল একটা বেদনা-ভরা অভিমান। আমাকে তুমি গান গাইতেই পাঠিয়েছ, তবু গানের অন্তর্লোকে প্রবেশ করবার চাবিকাঠিটি দাওনি। এ তোমার কি অবিচার ? কার কাছে যে আবদার করছে আনন্দ, সে কথা তার মনে ছিল না। গাইতে বসে তার কণ্ঠে সেই অভিমান-টুকুই ফুটে উঠছিল। তারপর গাইতে গাইতে তার মনে হল, অন্তরের অতলে কোন সুপ্ত পদ্ম যেন একটির পর একটি পাপড়ি মেলে ফুটে উঠছে। অভূতপূর্ব একটি আনন্দ-হিল্লোল অনুভব করেছে সে। আনন্দের মনে হল এতদিনে সে যেন তার কামনার কাছাকাছি এসেছে। প্রাণমনকে একাগ্র করলো আনন্দ। সমস্ত সত্তাকে এক করলো। মুগ্ধ ভ্রমরের মতো মধুমত্ত হয়ে তার সত্তা তারই গানের সুরে সুরে বিচরণ শুরু করলো। গাইতে গাইতে তদ্গত হয়ে অসীম কৃতজ্ঞতায় সেদিন যে অশ্রু পড়েছে তার চোখে, সে তা জানতো না।

গান সমাপন হলো অনেক রাতে। আসরের মানুষ তখন মন্ত্রমুগ্ধ। আজকের ভৈরবী ঠুংরীর সুরের পাখায় ভর দিয়ে যেন স্বয়ং বীণাবাদিনী এসেছিলেন এই গৃহে। তাঁর শরীরের কমলসৌরভ-ই যেন সুর হয়ে ঘরের কোণায় কোণায় এখনো বাজছে। কথা জোগাল না মুখে।

সমস্ত আসরের দিকে তাকিয়ে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলো আনন্দ। তারপর বেরিয়ে এসে আঁধারে মিশে গেল। সকলের চমক ভাঙলে যখন খোঁজ পড়লো আনন্দের, তখন আনন্দ কোথায়! তাকে পাওয়া গেল না।

সেই-যে অন্তরের জড় ভাঙলো আনন্দের, সেই-যে একবার সোনার-কাঠির স্পর্শ জানলো সে—আর আনন্দ ভুল করলো না। সে খ্যাতি চাইলো না, স্বীকৃতি পরিহার করলো। গান গাইতে হবে নিজের আনন্দে, পরের দিকে চেয়ে নয়। এই কথাটি জানতো না আনন্দ। জানলো যখন, তখন আর সে ফিরে গেল না।

আগ্রা থেকে কানপুর, হরিদ্বার, কেদার, জ্বালামুখী—কত জায়গাতেই যে ফিরলো আনন্দ দেড় বছর ধরে। তার ভাষা—গান। এই গানের মাধ্যমে তার নিত্যপূজা পাঠাতে হবে। আসর নেই শ্রোতা নেই, তাই গান হবে না? বড় অবাস্তব মনে হল এসব কথা। হাটের ধুলোয় বসে ইমন গাইলো আনন্দ কত দিন। সুরের কারুকাজ বুঝুক না বুঝুক, গায়কের অন্তর কথা কয় যে-গানের মধ্যে তা সহজেই স্পর্শ করলো গ্রামবাসীদের মন। দুধ এনে, ফল এনে, কম্বল বিছিয়ে তারা অনুরোধ করলো আনন্দকে থাকবার জন্যে। জায়গা যদি ভালো লাগল তো থাকল আনন্দ দুদিন। আবার কখনো অসময়ে মনের মধ্যে এল সেই আহ্বান। চরৈবেতির মন্ত্র যে জন একবার শুনেছে, সে কেমন করে একজায়গায় থাকবে! অনায়াসে সে-স্থান ছেড়ে চলে গেল আনন্দ।

হাটে, মাঠে, তীর্থস্থানে, এখানে ওখানে ঘুরে-ঘুরে শেষ অবধি আনন্দ এলো মথুরায়। তম্বুরাটি ভেঙে গেছে তার। তবু তম্বুরার অভাব বোধ করেনা সে। আজকাল যখনই গান গায়, অলক্ষ্যে যেন তানপুরায় সঙ্গত শুনতে পায় আনন্দ। কার আঙুলে যেন রিমঝিম তানপুরার সুর। আনন্দর মনে হয়, এমনি করে সে গান গাইবে,

তা-ই চেয়েছিল বাহার। চেয়েছিল বলেই আনন্দ পারলো। এমন শক্তিশালী বাহারের প্রেম যে, আনন্দকে ঘর ছেড়ে পথে বের করলো। তার প্রকৃত ঠাঁইয়ে ফিরিয়ে দিলো তাকে। সে-যে পথের ছেলে। পথ থেকেই শুরু হয়েছিল তার জীবন। পথেই তাকে ফিরিয়ে দিলো বাহার। আর, পথে বেরিয়েই সত্যিকারের সার্থকতার সন্ধান পেল আনন্দ।

মথুরাতে ঝোপ্‌ড়ির পাশে বসে-বসে আনন্দ ভাবলো—যত গান জানতাম, সব-ই তো জানালাম। যা শিখেছি আর জেনেছি, সব-ই সাধ্যমতো গাইলাম। এ কথা যদি বাহার জানতো, বড় খুশী হ'ত।

আবার ভাবলো, বাহারকে জানাবার কাজ তো তার নয়! সে শুধু গাইবে, তার সেই কাজ।

এই রাতে বসে বসে যোগিয়ায় 'পিয়াকো মিলন-কী আশ' আলাপ করতে করতে আনন্দের মনে হল—এই যমুনার মতো তারও যেন কোথাও যাবার কথা আছে। কালো আকাশ। ক্ষীণতোয়া যমুনা। এখন দারুণ গ্রীষ্ম। শীঘ্রই বর্ষা নামবে। তখন যমুনোত্রীর প্রসাদে ভরে উঠবে যমুনা। তখন এই নদী আবার সাগর-সন্ধানে যাবে।

যাবার একটা তাগিদ আনন্দও অনুভব করলো। সবাই চলেছে। বিশ্বসংসারে চলবার মন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত গ্রহ তারা নদী সমুদ্র সবাই চলছে। চলবার তাগিদটা তাদেরই মতো রক্তে রক্তে অনুভব করলো আনন্দ।

রওনা হতে গিয়ে মনে হল, যে ঘাটে সে সন্ধ্যাবেলা বসেছিল, সেদিক থেকে যেন কারও পরিচিত কণ্ঠে গান আসছে। অনেকটা যেন মোহনের গলা। আবার নিজের বিভ্রান্তিতে নিজেকেই তিরস্কার করলো আনন্দ। ভাবলো—ছাখো, আবার বিভ্রান্তির মায়ায় জড়াচ্ছি!

অস্থির হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলো আনন্দ।

মথুরার ঘাটে বসে গান শেষ করে মোহন তাকালো বাহারের দিকে। বললো—দেখলে তো! আনন্দ যদি থাকতো, তবে দেখতে পেতাম না আমরা?

বাহার বললো—যাব মোহন, তবে কাল একবার জয়পুরের দিকে চলো। যদি ওখানে গিয়ে থাকে সে?

—তীর্থে তীর্থে আর কত ঘুরবে বাহার?

বাহার ক্ষীণ হাসল। বললো—অনেক পাপ করেছিলাম হয়তো, তাই এমনি করে ঘুরে ঘুরে পাপ ক্ষালন করলাম মোহন।

—তাই হবে।

—তবু ছাখো, তাকে পেলাম না।

জবাব না দিয়ে হারমোনিয়মে সুর তুললো মোহন। পরিচিত গজল শুনতে-শুনতে আঁধার যমুনার দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল বাহার।

॥ তেরো ॥

বর্ষার নীলাঞ্জন ঘন ছায়াপুঞ্জ আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে। বিস্তৃত প্রান্তরে সন্ধ্যা নেমেছে। দূরে দূরে বিলীন পাহাড়ের সারি। উঁচুনিচু প্রান্তরের কোথাও পাথর, কোথাও লাল মাটি, কোথাও আম, কদম্ বা জাম গাছ ছটো-একটা চোখে পড়ে। সূর্য ডুবে গিয়েছে। রাঙা আলোটা মেঘের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে। মৌন ও গম্ভীর পরিবেশ। প্রকৃতি যেন সান্ধ্যপ্রণাম জানাচ্ছে সূর্যকে, চারিদিকে তাই বিনম্র প্রশান্তি।

এই পথ দিয়ে বয়াল-গাড়ী চড়ে চলেছে বাহার। অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা ছদিনের পথ আগেই চলে গিয়েছে।

বয়াল-গাড়ীর গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে বাহার। রুক্ষ চুলে বেণী বাঁধা, মোটা ও নরম একখানা দো-সুতীর চাদরে দেহ ঢাকা। হাত-দুখানা জড়ো করা কোলের ওপর।

বাতিটা জ্বালিয়ে টাঙিয়ে দেয় ছই-এ গাড়োয়ান। বাহার বলে—আর কতদূর মোহন? মোহন বলে—কাল বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে যাব, বাহার।

কাল বিকেলে—হিসেব করে বাহার, এখনও একটা দিন পুরো। বলে—সামনের গাঁ-এ পৌঁছব অনেক রাতে, তাই না?

—রাত এগারোটা হবে।

চুপ করে বাহার। ভাবনা-চিন্তা করবার দিন তার গিয়েছে। এখন নিজেকে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন যা হবার হোক। আশা নেই, তাই আশাভঙ্গ হবার ভয়ও নেই।

আনন্দের পদচিহ্ন সন্ধান করে কত জায়গাই যে ঘুরেছে তারা দেড় বছর ধ'রে। কন্‌খল, হৃষিকেশ, জ্বালামুখী, পুষ্কর, অম্বর, আজমীঢ়,—ওদিকে পুরী, কোণারক—যেখানে যখন আনন্দের খোঁজ পেয়েছে সেখানেই গিয়েছে বাহার। কত জন খোঁজ দিয়েছে, কত জন বলেছে—শুনেছি বটে সেই গায়কের নাম। গান তো শুনিনি। কত জন বলতেই পারেনি।

ঘরে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ফিরবার পথে মথুরা ছাড়িয়ে এসে খবর পেল তারা, গণ্ডগ্রাম পিপ্পলপাঁতি ছাড়িয়ে যমুনার বাঁকের ওপর জন্মাষ্টমীতে মেলা বসে। সেখানে আছে মুরলী-মনোহরের মন্দির। চারশো বছরের পুরোনো জরাজীর্ণ মন্দিরটায় সারা বছর ধরে একশোটা লোক আসে কিনা সন্দেহ। জন্মাষ্টমীর সাত দিন আগে মন্দিরের মালিক ঠাকুর-সাহেবদের মানুষ এসে চালা বাঁধে যমুনার ধারে। দোকানীরা দোকান জমা নেয়। এ অঞ্চলের বাৎসরিক শিকার-হাটাও এটাই। এই সময়ে গোরু, ঘোড়া, ছাগল,

ভেড়া, হাতি বিক্রি হয়। কোন মন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে জন্মাষ্টমীর দিন এখানে স্নান-দানে মহতী পুণ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী। তাই আশপাশের গ্রামের মানুষ, মথুরা-প্রয়াগ করবার ক্ষমতা যাদের নেই, তারাই দলে দলে আসে। এই মেলার নাম শুনে কি-যে মনে হল বাহারের, বললো—চলো, ঘুরে যাই মোহন।

—কি লাভ বাহার?

—লাভের কথা তো ভাবিনি মোহন—পথে পড়বে একটা তীর্থ, চলো ঘুরে দেখে যাই।

এই-যে তীর্থকামী মানুষরা চলেছে, কি জ্বলন্ত বিশ্বাস তাদের মনে! দণ্ডী কেটে, বুকে হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে তারা মানসিক শোধ দিতে চলেছে। যে নদী পেরিয়ে গ্রীষ্মে গোরু-বাছুর নিয়ে ছেলেরা যাওয়া-আসা করেছে, শীতে যার চরে উত্তর-দেশের পাখীগুলি বাসা বেঁধেছিল, চৈত্র মাসে যার বালি খুঁড়ে জল নিয়ে ঘটি ভরেছিল ক্লান্ত পথচারী—সেই অতিপরিচিত নদীটাই তাদের চোখে বিশেষ হয়ে উঠেছে আজ।

এই বিশ্বাস করবার ক্ষমতা যদি তারও থাকত! কোন অদৃশ্য শক্তির ওপর যদি স্বীয় শুভাশুভ ছেড়ে দিতে পারত। কন্‌খলের পথে সহযাত্রী বৃদ্ধ সাধুটি তাকে বলেছিল—নিজের ভাবনা ঈশ্বরকে সমর্পণ না করলে জীবের মুক্তি নেই।

সেদিনও তার কথা মানতে পারেনি বাহার। একজন মানুষকে জানতেই জীবন ফুরিয়ে যায়, তবু জানা হয় না—মানুষকে ছাড়িয়ে তাই অন্য আরাধ্য কোনদিনই খোঁজেনি বাহার।

আকাশ-পাতাল ভাবে বাহার গাড়ীর ছই-এ মাথা রেখে। আঁধারে মুঠো-মুঠো জোনাকি জ্বলে। লণ্ঠনটা দোলে ছই-এর মাথায়। গোরুর গাড়ীর চাকা থেকে শব্দ আসে একঘেয়ে। বাদলা-বাতাসের ভিজে ঝাপ্‌টায় কেয়াফুলের গন্ধ। বাহারের মনে হয়, এমনি করে

যেন কতদিন সে চলেছে আনন্দের সন্ধানে অনাদি অনন্তকাল ধরে—এখনো চলেছে, চলেছে—সে চলার বিরাম নেই।

গ্রামের কাছে যখন পৌঁছায় গাড়ী, তখন কানে আসে যাত্রীদের কোলাহল। বহু মানুষের কণ্ঠের বিমিশ্র কোলাহলে সব কথা বোঝা যায় না। যমুনাজোড়—নামের জমজমা অনুপাতে গ্রামটা অনেক ছোট। তাকেই ঘিরে আজ গোরু, বয়াল ও মোষের গাড়ীর হাট বসেছে। চারখানা বাঁশের মাথায় কম্বল দিয়ে ছাউনি বানিয়ে বিশ্রাম করছে তীর্থযাত্রীরা। কয়েকটা জায়গায় রান্নার আয়োজন চলছে, তার আগুন চোখে পড়ে। তাদেরই একপাশে গাড়ী বাঁধল গাড়োয়ান। গন্তব্যস্থান কাছে এসেছে, তাই উৎসাহও হয়েছে যাত্রীদের।

ভোর না হ'তে আবার শুরু হয় যাত্রা। এবার তাদের অনেক সঙ্গী। এমন ভাবে চললে পরে দুপুরের মধ্যে পৌঁছনও বিচিত্র নয়। কাছে অনেক গন্তব্য স্থান, আর যাত্রীরা সমবেত হাঁক দেয়—জয় মুরলীমনোহর, জয় যমুনাজী! যাত্রী মন্থন ক'রে পুকার ওঠে—জয়-জয়!

সকালের আলো ফুটতেও আঁধার কাটে না—আকাশ আজ এমনই নিকষ কালো হয়ে রয়েছে। মেঘের ভারে যেন নেমে এসেছে আকাশখানা। গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির সঙ্গে তীব্র বাতাসের ঝাপ্‌টা আসে। মুখ তুলে বাতাসের গতি ও আকাশের চেহারা অনুধাবন করে যাত্রীরা।

অতি দূর থেকে একটা একটানা শব্দ আসছিল। ধীরে, অতি ধীরে সে শব্দটা স্পষ্ট হ'তে থাকে। পথ এবার উঠেছে উৎরাই-এর দিকে। জমি অতি ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে এখানে। সেই ঢালু দিয়ে যেমন ওঠে গাড়ী তেমন বাতাসের ঝাপ্‌টা জোরালো হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে মস্ত একটা কোলাহলও।

তারপরই সামনে চোখে পড়ে দূরের একখানা ছবি। অনেক গাড়ী ভীড় করে আছে, অনেক মানুষ চলাফেরা করছে। মেলার ঘরদোরও দেখা যায়—কিন্তু সে আরো দূরে। তবে কি যাত্রীরা পৌঁছয়নি?

জয়-জয় ধ্বনি তুলতে তুলতে উৎসাহিত যাত্রীদল এগোতে থাকে। সে উৎসাহের উত্তেজনা বাহারের মনেও লেগেছে। ঝুঁকে প'ড়ে সে ঠাহর করে দেখে।

এই যাত্রীদের মধ্যে পৌঁছতে পৌঁছতে জনসমুদ্রের বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে। মানুষের ভীড়ে এমন আট্‌কে গিয়েছে পথ, যে আর এগোনো যাবে না। গাড়ী থামিয়ে দেয় গাড়োয়ান।

একটা উত্তেজিত বিশৃঙ্খলা এবং চূড়ান্ত বিভ্রান্তি মানুষগুলোর মধ্যে। কি হয়েছে! একজায়গায় উঁচু করে টাঙানো লাল সামিয়ানা —সেখান থেকেই কোলাহল উঠছে বেশী।

আশ্চর্য হয়ে বাহার নেমে দাঁড়ায়। মোহন চলে ভেতরে খবর নিতে। বাহারও যায়। বাহারের হাত শক্ত মুঠিতে ধ'রে ভেতরে যেতে গিয়ে বাধা পায় মোহন। সরকারী লোকের তাঁবু। পুলিশও রয়েছে। কি হয়েছে? জবাব শুনে অবাক হয়ে যায় তারা।

যমুনাতে 'বাঢ়' আসছে। জলে এবার অস্বাভাবিক স্ফীতি দেখেই কর্তৃপক্ষের ভয় হয়েছিল—মেলার অবস্থান সরিয়ে নিতে হুকুম দিয়েছিলেন। শুধু তো মেলা নয়। মুরলীমনোহরের সুপ্রাচীন মন্দির, যা যমুনার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে কত বছর ধরে—তার ঘাটেই স্নান ক'রে মানুষ সেই মন্দিরে পূজা দেয়। পরশু থেকে জলের গতি বেড়েছে অস্বাভাবিক, পাক দিচ্ছে বড় বড়—জল ক্রমেই উঠে আসছে।

মেলা বা দেবালয় নয়, সমগ্র জনপদের জীবনই বিপন্ন। পূজারীরা বিপদ সমাসন্ন দেখে দেউল থেকে মূর্তি সরিয়ে এনেছেন এখানে। নদীর দুই ধার ছেড়ে পালিয়ে এসেছে মানুষ। মেলার ঘরবাড়ী যেমন তেমনি পড়ে আছে। খুঁটির মাথায় লাল বাতি জ্বলছে বিপদ ঘোষণা ক'রে। এখানেও থাকা চলবে না, তাই সব সরিয়ে দিতে চান কর্তৃপক্ষ। এ জায়গা উঁচুতে, কিন্তু নদীর গতির কোন স্থিরতা নেই।

তাই ঘোষণা করা হচ্ছে—তফাত যাও···বাঢ় আসছে···বাঢ় আসছে! এদিকে পূজারীরা জানাচ্ছেন—নতুন মন্দির চাইছেন মুরলীমনোহর··· তাই এই লীলা করে পুরোনো ঘর তিনি ছেড়ে এলেন—নতুন মন্দির চাই তাঁর!

দেবতা ভিখারী হয়েছেন—মানুষ যে যা পাচ্ছে নামিয়ে দিচ্ছে চাদরের ওপর। উঁচু হয়ে উঠছে পয়সা। স্বামীজিরা পানীয়জল দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

যমুনার কল-কল্লোল কানে আসে। মানুষের কথা ছিট্‌কে-ছিট্‌কে এসে পড়ে। সকলে এসেছে কি?···নিশ্চয়। বৃদ্ধ চাষীটি বলে— সবাই এসেছে, এমন কি কীটপতঙ্গও উঠে আসছে উপরের দিকে— ওরাই আগে টের পায় কিনা?

—সাধুজী এসেছেন?— একজন প্রশ্ন করে।

—কোন্ সাধুজী?

—গাওয়াইয়া সাধুজী? সেই বাউরা মানুষ?

—তিনি দেউল ছেড়ে আসেননি।

উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে অনেক নিচে ও দূরে নদীর তীরে একটা গাছ দেখিয়ে যাত্রীরা বলে—ওখানেই দেউল···ওখানেই রয়েছেন সাধুজী। সবাই বললো, তিনি এলেন না কিছুতেই।

—কিরকম সাধু? ভয় নেই তার?— একজনের প্রশ্নে আর-একজন জবাব দেয়—সাধুর লক্ষণ কি গেরুয়া আর কৌপীন-জটায়? যে সাধুই হোক, বড় সাধক মানুষ—। কিছুতেই এল না।

কথায় কথা টানে। কেউ কেউ বললো, কি সুন্দর চেহারা, কোথা থেকে এলেন কে জানে! দেবতাও মন্দির ছেড়ে এলেন, তবু তিনি এলেন না।

চলতে চলতে সাধুর কথা কয়েকবার শুনল তারা। হঠাৎ কানে এসে বাজল একটা কথা। দেহাতী মানুষ একজন কৈফিয়ত দিচ্ছে

মেলার কর্মচারীকে ; বলছে—চোখে দেখিনি, কিন্তু গান শুনেছি কাল রাতেও। মন্দির ছেড়ে সাধুজী আসেননি।

—গান শুনেছ ? তার-ই ?

—আপনি শোনেননি হুজুর, কাল আমরা অনেক রাত অবধি শুনেছি। বাতাসের জোর ছিল, গানের সুরও আসছিল। তিনি আসেননি।

—পাগল হবে— কর্মচারীটি চলে যায় নিজের কাজে। ভীড়েব চাপে দাঁড়ানো যায় না, তবু বাহার চাষীটির হাত চেপে ধরে। বলে—কোন্ সাধুর কথা বলছ ?···কি নাম তাঁর ?

—জানি না···গান শুনেছি তিনদিন ধরে। কোথা থেকে এলেন তাও জানি না। এমনিই চলে এলেন···মন্দির থেকে তখন সবাই সবে এসেছে। ভাঙা মন্দির—সবাই মানা করল। সাধুজী শুনলেন না। কারও সাথে কথাও বললেন না···গান গাইতে গাইতে মস্তি এসে গেল সাধুজীর। চুপ করে গেলেন।

বাহারের চোখে জল টলটল করে। বলে—কিরকম শুনলে গান ? আবার বলো···

মোহন বলে—বাহার !

বাহাব বলে—মোহন···আমি একবার যাব ?

—পাগল হয়েছ ?···মোহনের কথা শেষ হতে পায় না। আকাশ থেকে মাটি অবধি বৃষ্টির একখানা সাদা পর্দা দূরদিগন্ত থেকে লাখ লাখ ঘোড়সওয়ারের মতো ছুটে আসে কলরোল ক'রে। একটা অনতিপরিসর জায়গায় পনরো-বিশ হাজার লোকের ভীড়টা দুলে ওঠে—সমুদ্রে জোয়ার আসবার সময়ে যেমন এদিক ওদিক থেকে অনির্দিষ্টভাবে অনেকগুলো জলের তরঙ্গ এসে একটা বিশৃঙ্খল আবর্তের সৃষ্টি করে—ভীড়টাকে দেখেও তাই মনে হয়।

ভীড়ের মধ্যে হাত ছিট্‌কে যায় বাহারের। ধাক্কায় ধাক্কায়

সরতে সরতে যখন বেরিয়ে আসে সে—তখন চলমান জনসমুদ্রটা নিজের তাগিদেই ওপাশে সরে যাচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বর্শার মতো এসে পড়ছে। বাতাসের ধাক্কায় বৃষ্টিধারাগুলো ঝাপ্‌টা দিয়ে দুলে দুলে যাচ্ছে। পায়ের তলায় বেঁধে কাঁকরগুলো। পথ খুঁজে ছুটে চলে বাহার। বৃষ্টিতে চোখ চলে না—তবু যমুনার উন্মত্ত কল্লোল নিকট থেকে নিকটে আসে। মনে হয় পথ ভুল হয়নি। সে কি যমুনার ডাক? অথবা কোন গান? বোঝা যায় না। কাঁকর ছেড়ে এবার বালি শুরু হয়েছে। বালিতে পা বসে যায়—চলতে চায় না। এদিকে আকাশ-বাতাস মন্থন করে বর্ষণের যে ভৈরবলীলা শুরু হয়েছে, তাব মাতামাতিটা সঙ্গীতের মতোই পঞ্চম সপ্তক ছেড়ে পর্দায় পর্দায় উঠতে থাকে। সে-সঙ্গীতে সাড়া দিয়ে মেতে উঠতে থাকে যমুনা। জলের কলকল্লোলের তলা থেকে একটা গম্ভীর নিনাদ গম্‌গম্‌ করে ওঠে। ঘন কালো দেখায় জল আকাশের কালো ছায়া প'ড়ে। জল ফুলে ফুলে উঠে মেঘকে ধরতে চায়, মেঘের স্তম্ভগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে চলে—মানুষ ও মানুষের সৃষ্ট যা-কিছু সব তুচ্ছ ক'রে নদী ও আকাশের এই মাতামাতি চলে। ভয়ার্ত জনতা বলে—বাঢ়! বাঢ়! বাঢ় আঈ বে …কোথায় ডুবে গিয়েছে সেই আর্তনাদ। এই সব-কিছুর মধ্যে মানবীয় সত্তাটাকে মিলিয়ে দিয়ে ছুটে চলে বাহার। একবার বৃষ্টি কমতে ঠাহর হয় সামনেই সেই দেউল। নদী তার দিকে উঠে আসছে মনে হয়। পায়ে লাগে নদীর জল। দাঁড়িয়ে পড়ে বাহার। গান শুনতে এবার আর ভুল হয় না। কণ্ঠ চিনতেও ভুল হয় না। গোড়ালিতে ছলাৎ করে লাগছে ঢেউ। বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলে বাহার। দেউল দীর্ণ করে যে অশ্বত্থগাছটা উঠেছে, তার শিকড়গুলো ঝাপ্‌টায় বাহারের মুখে চোখে—পা ছাপিয়ে জল উঠছে…একখানা ঝুরি ধরে বাহার। আলগা হয়ে আসে শিকড়—জলের পাকে ভিতের শ্যাওলা-ধরা পাথরগুলো কাঁপছে স্পষ্ট চোখে পড়ে তার। —আনন্দ!

ডাকতে গিয়ে কণ্ঠ হারিয়ে যায়। একটা কণ্ঠ এমন লক্ষ কণ্ঠ হয়ে গান গায় কি করে—মনে করে বিস্ময় মানে বাহার। সিঁড়ি নেই? হাত দিয়ে-দিয়ে অবলম্বন খোঁজে বাহার।

শুধু বাহার নয়, আনন্দও তখন গান শুনছে মন-প্রাণ দিয়ে। জীর্ণ দেউলখানা ঘিরে লক্ষ লক্ষ বাহুতে তরঙ্গ ফুঁসে উঠছে—বিশ্বচরাচর ব্যেপে চলেছে মন্থনলীলা! তার মধ্যে তার একখানা কণ্ঠের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেন জল নয়, সুরের একটা বন্যা ছুটে এল। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হারিয়ে গেল একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের প্লাবনে। কোথায় ছিল এই সঙ্গীতের মহাজলধি? সাধক-গায়কের ধ্যানধারণার চিরাকাঙ্ক্ষিত রাগ-রাগিণী যেন একসঙ্গে মুক্তি পেল—এই মহাপ্রলয়ের তালে তালে অণু-পরমাণু থেকে যেন উঠে এল তারা। সুরে সুরে, রাগ-তাল-মান-লয়ে মিলিত হয়ে তারা আনন্দের শ্রবণ-মনন হরণ করে নিয়ে আপনার আনন্দে আপনি দুলতে লাগল!

এত সঙ্গীতের মাঝখানে বসে কি গান গাইবে আনন্দ? শরীর থেকে মন, মন থেকে প্রাণ, প্রতি রক্তকণিকায় ছড়িয়ে গেল এক অসীম কৃতজ্ঞতা-বোধ, মহানন্দের এক পরম উপলব্ধি! তানপুরার ওপর মাথা রাখল আনন্দ। বাহারের কণ্ঠে কে তাকে ডাকল? এ ডাকও তার অন্তর থেকেই উঠেছে নিশ্চয়, তাই সে শুনেছে এই ডাক। দেউলটা দুলছে, কাঁপছে, কলকল্লোলে সঙ্গীতে মন্দ্রিত হচ্ছে, যমুনার ডাক শোনা যাচ্ছে;—সব চেতনার শেষ স্তরে এ এক চরম আনন্দের মুহূর্ত—তাই সে বাহারের ডাক শুনেছে। তার মধ্যে এক হয়ে গিয়েছে বাহার। বড় কৃতজ্ঞ হল আনন্দ—যে এই সময়েও বাহারকে সে হারায়নি, এ আনন্দ সে একলা উপভোগ করেনি,—তারা দুজনেই একসঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে।

সমস্ত অন্তরাত্মা তার প্রণতি জানাল। সেই শেষ প্রণতির ভঙ্গীতে যখন তার মাথা বিনত, তখন মহানন্দে যমুনা উঠে এল চারি পাশ দিয়ে,—দেউল, অশ্বত্থগাছ, দুটি নরনারী—সমস্ত গ্রাস করে নিল লক্ষ লক্ষ বাহু তুলে। ফুলে ফুলে, দুলে দুলে কালো জল খেলা করতে লাগল দেউলের ভিতে ভিতে।

—